KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-70000

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর ওহাব
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫২/৫ ৫২/৬ ৫২/৭ ৫২/৮	Year of Publication : ভাদ্র ১৩৯৮ ॥ Sep 1991 আশ্বিন ১৩৯৮ ॥ Oct 1991 কার্তিক ১৩৯৮ ॥ Nov 1991 অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ ॥ Dec 1991
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৭ নভেম্বর, ১৯৯১

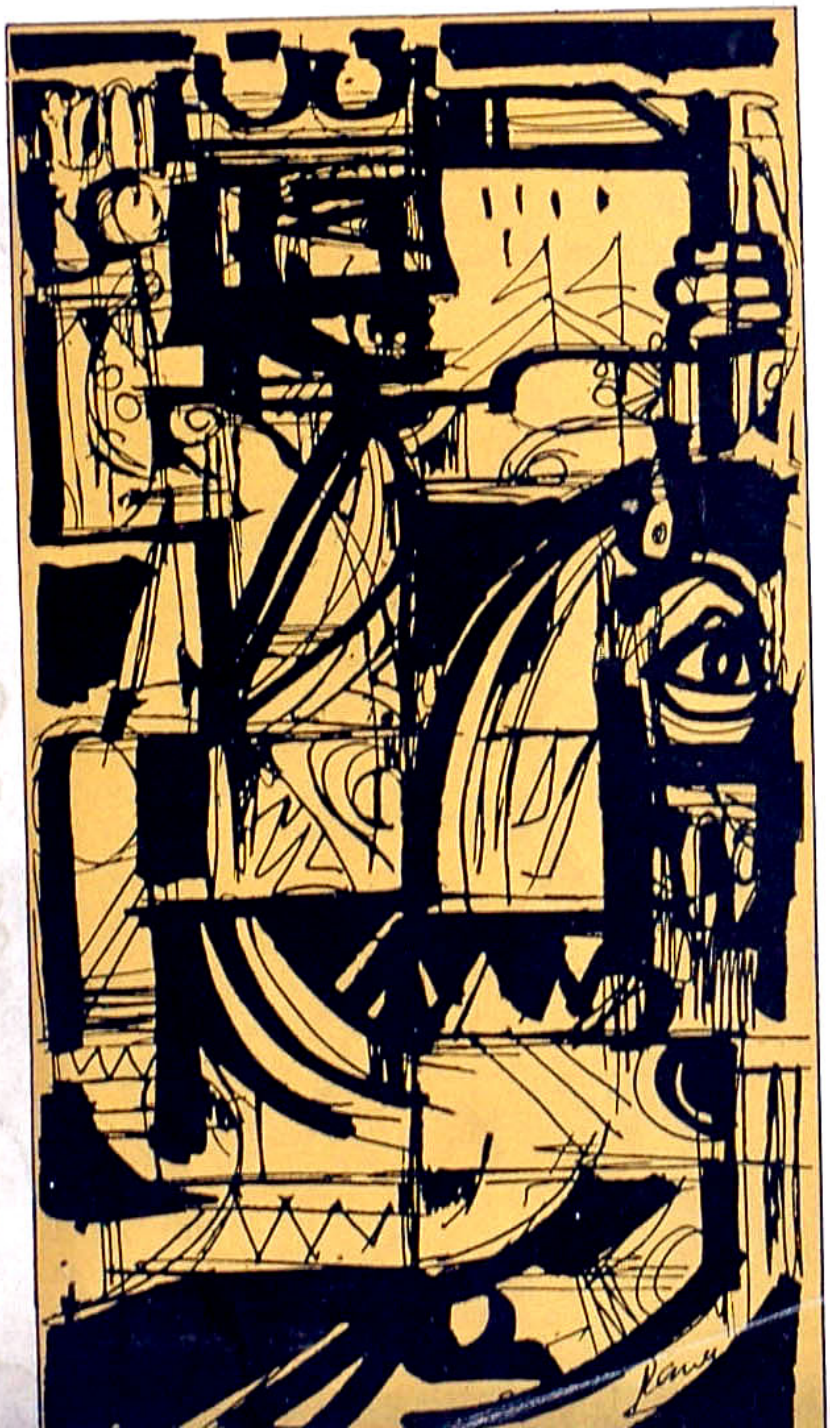

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত।

ভাষাচার্য স্মরণে বিদগ্ধজনদের দ্বারা লিখিত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধসংকলনের সুরজিৎ দাশগুপ্তকৃত পর্যালোচনা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা এবং জাতীয় সংহতির সমস্যা নিয়ে লিখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন সচিব অশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী লিখিত "ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির"-এর দ্বিতীয় কিস্তি।

"বাঙালির পলিটিক্স" নিয়ে সরস ভঙ্গিতে গভীর আলোচনা।

আত্মধারণা বিষয়ে দর্শনশাস্ত্রের একটি মৌলিক তত্ত্ব প্রসঙ্গে ফরাসি চিন্তাবিদ মিচেল ফুকো উত্থাপিত কিছু প্রশ্ন।

ঐতিহ্যস্মৃতি এবং মধুসূদনের কাব্যভাবনা বিষয়ে গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী।

টি· এস· এলিঅট এবং বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে গ্রন্থসমালোচনা।

*** *** ***

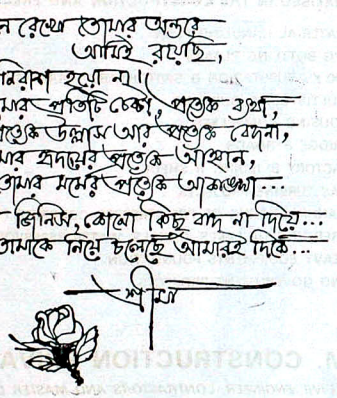

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...
— শ্রীমা

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৭
নভেমবর ১৯৯১
কার্তিক ১৩৯৮

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভবতোষ দত্ত ৫২১
ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা অশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৭
ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির সুধীর চক্রবর্তী ৫৫১

ও শাঁখ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৩২
ভোর কমল দে সিকদার ৫৩৩
বিশ্বপাষাণে, গাজনে দাউদ হায়দার ৫৩৪
কৌতুক শৌনক বর্মণ ৫৩৬

ঘর কামাল হোসেন ৫৪৪

প্রসঙ্গ দর্শন ৫৬৬
আত্মধারণার প্রযুক্তি পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থসমালোচনা ৫৭৬
সত্যজিৎ চৌধুরী, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, গৌতম নিয়োগী,
সুজিৎ ঘোষ

বাংলাদেশ থেকে ৫৯৫
বাঙালির পলিটিকস আশরাফ শামীম

মতামত ৬০৪
কল্যাণকুমার দত্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

The fine art of business

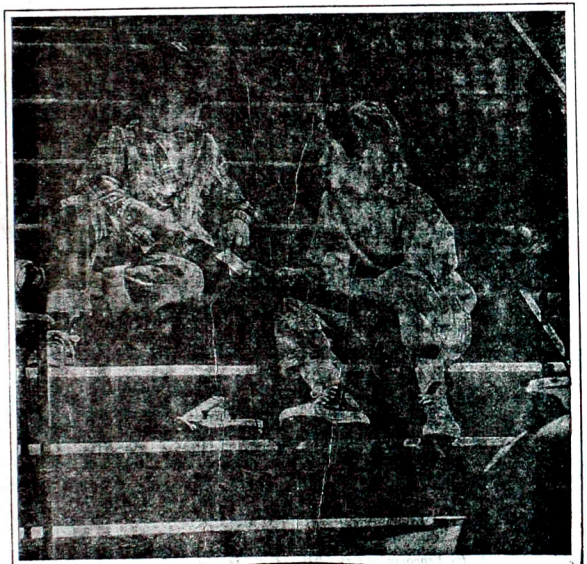

APEEJAY
SURRENDRA

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভবতোষ দত্ত

১৯১৯-এ বাঙলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য সুনীতিকুমার বিলাতে যান। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। কিন্তু ১৯১৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য গবেষণার যে বিষয়টি তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেটি ছিল বাঙলা ভাষার তুলনাত্মক ব্যাকরণ রচনার প্রস্তাব (An Essay Towards an Historical and Comparative Grammar of the Bengali Language)। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক বাঙলা ব্যাকরণ নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন—এর মধ্যে বিস্ময়ের বিষয় থাকলেও সুনীতিকুমারের মনীষার সম্বন্ধে যাঁরা কিছু জানেন, তাঁদের কাছে এটা বিস্ময়জনক নয় এবং সুনীতিকুমারের মতো প্রতিভার কাছে এটা আকস্মিকও নয়। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ভাষাগোষ্ঠী-চর্চা বিশেষ বিষয় হিসাবে নিয়েছিলেন। তাতে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইংরেজি, প্রাচীন জার্মান ভাষাতত্ত্ব। অর্থাৎ ভাষারহস্য অনুধাবনে প্রথম থেকেই তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। আবার তখন আলাদা করে সংস্কৃত ও বৈদিক সাহিত্যও অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর এই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কিন্তু তিনি বাঙলা ভাষা বিচারেই প্রয়োগ করলেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই *Origin and Development of Bengali Language* (1926) প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রবাসী এবং সবুজপত্রে, সেগুলি সবই বাঙলা ব্যাকরণ ও উচ্চারণতত্ত্ব নিয়ে। দেখা যাচ্ছে তাঁর মূল কাজের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার পর থেকে বাঙলাভাষাচিন্তাই তাঁর মনকে অধিকার করেছিল।

বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগের বিশেষ কারণ কী ছিল জানি না। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, সুনীতিকুমারের পঠদ্দশায় বাঙলা ভাষা এবং তার ব্যাকরণ নিয়ে বেশ একটা আলোচনার পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে উঠেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাঙলা শব্দপ্রয়োগ এবং ব্যাকরণ নিয়ে সেকালের সুপরিচিত পণ্ডিতেরা বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র বটব্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বাঙলা ভাষারহস্য নিয়ে কৌতূহলী ছিলেন। তাঁর অনুসন্ধান এবং আলোচনার

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৬. ১১. ১৮৯০, মৃত্যু ২৯. ৫. ১৯৭৭ তারিখে। ভাষাচার্যের জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ সন্দর্ভটি প্রকাশ করা হল।

পদ্ধতি ছিল একটু ভিন্ন। প্রচলিত প্রথাবদ্ধ ব্যাকরণ আলোচনার রীতিতে তিনি ভাষা নিয়ে চিন্তা করেন নি। ভারতী, বালক, সাধনা পত্রিকাতে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন—প্রয়োগের ইতিহাস বা ব্যুৎপত্তি দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞান বা অর্থের অভিব্যক্তি হিসাবে "বাংলা বহুবচন", "সম্বন্ধে-কার", "বাংলা উচ্চারণ" নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাতেও তিনি লিখেছিলেন—"বাংলা শব্দদ্বৈত" "ধ্বন্যাত্মক শব্দ", "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত"। "বাংলা ব্যাকরণ", "ভাষার ইঙ্গিত", "বাংলা ব্যাকরণে তির্যক-রূপ", "বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য", "বাংলা নির্দেশক", "বাংলা বহুবচন" এবং "স্ত্রীলিঙ্গ"—প্রবন্ধগুলি বেরিয়েছিল বঙ্গদর্শন, ভারতী, বিশেষ করে প্রবাসী পত্রিকাতে। ১৯০৯-এ এর অনেকগুলি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয় "শব্দতত্ত্ব"। রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-আলোচনার উল্লেখ করে সুনীতিকুমার তাঁর *ODBL*-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন—

The first Bengali with a scientific insight to attack the problems of language was the poet Rabindranath Tagore; and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language and a great poet and seer for all time a keen philologist as well, distinguished alike by an assidious enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and findings of the modern western philologist. The work of Rabindranath is in the shape of a few essays (now collected in one volume) on Bengali phonetics, Bengali onomatopoetic and on the Bengali noun and on other topics, the earliest of which appeared in the early nineties, and some fresh papers appeared only several years ago. These papers may be said to have shown to the Bengali enquiring into the problems of this language the proper lines of approaching them.

রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলিকেই সুনীতিকুমার আধুনিক ভাষাতত্ত্ব আলোচনার সঠিক পথনির্দেশক বলেছেন যদিও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের ভাষালোচনাও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। সুনীতিকুমার বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের এবং তাঁর পূর্বেকার বাঙলা ব্যাকরণের বিচারে আলোচনায় প্রধানত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুস্মৃতিই লক্ষ করেছিলেন। এসব ব্যাকরণে খাঁটি বাঙলা প্রয়োগকে বলা হত অসাধু এবং সংস্কৃতানুসরণকেই বলা হত সাধু। রাজা রামমোহন রায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে ইংরেজিতে প্রথম যে ব্যাকরণ লেখেন এবং পরে যার বাঙলা করেন ১৮৩৩-এ তাতে তিনি বাঙলার নিজস্ব রীতিকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। সুনীতিকুমার লিখেছেন,

'ব্যাকরণ বিষয়ে রামমোহনের চিন্তার ধারা অনুসরণ করে কিন্তু বেশির ভাগ বাঙালী পণ্ডিত মাতৃভাষার চর্চা করতে নামেন নি। ছোটো বড়ো প্রায় সমস্ত বাঙালী ব্যাকরণকার বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের সব খুঁটিনাটি বাঙলাতেও আনতে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভাষা বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় এই কয়জনের – চিন্তামণি গাঙ্গুলী, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আর রবীন্দ্রনাথ।'*

সুনীতিকুমার ১৯২৬-এই তাঁর প্রথম ইংরেজি বই প্রকাশকালেই তাঁর পূর্বসূরী বাঙালি ব্যাকরণ-কারদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব লক্ষ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচনাই যে ঠিক সেটা বুঝে নিতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাতেও স্বতন্ত্র স্বাধীন বাঙলাভাষাপ্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সৌভাগ্যক্রমে এঁরা দুজনেই সুনীতিকুমারের প্রথম গবেষণাবৃত্তির জন্য প্রস্তাবিত নিবন্ধ *'The Sounds of Modern Bengali*-র পরীক্ষক ছিলেন। বাঙলা উচ্চারণ-নীতিকে এতখানি প্রাধান্য দিয়ে ব্যাকরণ রচনার কল্পনা ইতিপূর্বে কেউ করে নি। সে চেষ্টার বিচ্ছিন্ন প্রয়াস দেখা গিয়েছিল হরপ্রসাদ এবং রামেন্দ্রসুন্দরের বিচার ও অনুসন্ধানে। বাঙলা উচ্চারণ এবং ভাষার জীবন্ত লক্ষণগুলিকে সামনে রেখে উৎস সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্কটিতে যথাযথ বিচার করে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আলোচনার নূতন পথ প্রদর্শন সুনীতিকুমারই করলেন।** এজন্য সুনীতিকুমারকে যান্ত্রিকভাবে নিছক ভাষাতাত্ত্বিক বলা যথেষ্ট নয়। তত্ত্বের সঙ্গে তিনি জীবন্ত ভাষালক্ষণগুলিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে দেখেছেন। ভাষার সঙ্গে জীবনের যে যোগ সহজ ও স্বাভাবিক, সেই যোগটিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়। তিনি বলেছেন, তাঁর গ্রন্থে এমন অনেক কথাই হয়তো এসেছে, যাকে প্রসঙ্গচ্যুত মনে হতে পারে কিন্তু that was due partly to the fact that an appreciation of the racial, historical and cultural background was thought to be helpful in following the linguistic development। ভাষাবিচারের ক্ষেত্রে জাতির ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গগুলির প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন।

ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যে শিক্ষা লাভ করে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েও বাঙলা ভাষাই ছিল তাঁর মনোযোগের বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন ইংরেজি এবং জার্মান ভাষাতত্ত্ব পড়ছিলেন, তখনই তাঁর মনে হয়েছিল ভাষাতত্ত্বানুশীলনের আধুনিক পদ্ধতিকে বাঙলা ভাষাতেও প্রয়োগ করা সম্ভব, কেননা বাঙলা তো সেই একই ইন্দোইউরোপীয় ভাষারই পরিণাম। বাঙলা ভাষা যে ইন্দোইউরোপীয় ভাষা থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, এ-তথ্যটি সার উইলিয়ম জোনস এবং পরবর্তী বহু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা সূচিত হয়েছিল। সংস্কৃত গ্রীক প্রাচীন জার্মান ভাষার তুলনা করে একটি আদি ভাষাজননী কল্পিত হয়েছিল। পূর্বদিকে তারই বিবর্তনে ইন্দোইরানীয় এবং আর্যভারতীয় ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিকেরা নিঃসংশয় হয়েছেন। এই আর্যভারতীয় ভাষা থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্যভাষার সৃষ্টি। এই পর্যন্ত ফ্রানৎস বপ্‌ এবং জার্মান পণ্ডিতেরা যে ছকটা করে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস রচনা করতে সেই ছকটাই ছিল ভিত্তি। তারপর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন বীমস লিখলেন *Outlines of Indian Philology*। তাঁর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ *Comparative Grammar of the Aryan Languages of India*-র শেষ খণ্ডটি বের হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের Wilson Philological Lectures-এ (1877) নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি তুলনাত্মক আলোচনার আরম্ভ করে দেয়। অতঃপর হর্নলের *Comparative Grammar of Gaudian*

* দ্রষ্টব্য : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনীষী স্মরণে (১৯৭২) 'ব্যাকরণকার রামমোহন' প্রবন্ধ।

** ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতি এবং বাংলা উচ্চারণ ও নিজস্ব স্বাধীন ভাষারূপের প্রতি লক্ষ রেখে সুনীতিকুমার পরে লিখেছেন "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" (১৯৩৯)। পরে এর আরও তিনটি গ্রন্থরূপ দিয়েছিলেন।

Languages with a Special Reference to Eastern Hindi (১৮৮০) এবং আব্রাহাম জর্জ গ্রিয়ারসনের *Linguistic Survey of India* (প্রথম খণ্ড ১৯০৬) সুনীতিকুমারের কাজের পটভূমি রচনা করেছিল। সুনীতিকুমার এঁদের সকলেরই উল্লেখ ও ঋণ স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর নিজের কাজের মডেল বা আদর্শ ছিল জুল ব্লখের *La Formation de la Langua Marathe* (১৯০৮)। ইউরোপে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে ভাষার পরিবর্তনের কতকগুলি সাধারণ সূত্র এবং নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই নিয়মগুলি জানা হয়ে গেলে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কালে ভাষার পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করাও সহজ হয়ে যায়। সুনীতিকুমার তাঁর ছাত্রাবস্থায় প্রাচীন ভাষা পড়বার সময় এই নিয়মগুলি জেনে মুগ্ধ হন এবং বাঙলা ভাষার পর্যালোচনাতেও এগুলি প্রয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বাঙলা ভাষার ব্যাকরণের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে যেমন আলোচনা তিনি দেখেছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে তেমনি ভাষাবিবর্তনের একটা পৃথিবীব্যাপী ঐতিহাসিক ঘটনার রহস্যের প্রতিও তিনি সেই সময় থেকেই কৌতূহলী হয়েছিলেন।

ভাষাবিবর্তনের ধারা, বাঙলা উচ্চারণ-প্রকৃতি এবং বাঙলা ভাষার স্বতন্ত্র প্রবণতা লক্ষ করে সুনীতিকুমার ক্রমেই অনুভব করলেন বাঙলা ভাষায় এমন বহু উপাদান আছে যাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের বাঁধা নিয়মে ফেলা যায় না। সংস্কৃত বানানের সঙ্গে বাঙলা উচ্চারণ মেলে না। সংস্কৃত কারক, অনুসর্গ বাঙলায় ভিন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সবটাই বিবর্তনের জন্য নয়। বাঙলায় অজস্র শব্দ পাই, সংস্কৃতে যার মূল নির্ণয় করা যায় না। এ-রকম কেন হয়। তখনই তিনি অনুভব করলেন ভারতবর্ষে বহু জাতির ভাষা প্রচলিত, তারা পরস্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এটা দু হাজার তিন হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। ইন্দোইউরোপীয় এবং আর্যভাষা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা দ্রবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গলয়েড প্রভৃতি জাতির ভাষার কথা বিবেচনা করেন নি বা করবার দরকার মনে করেন নি। স্বভাবতই সুনীতিকুমার বাঙলা ভাষায় তথাকথিত অনার্য উপাদানের সন্ধান করতে লাগলেন। তার থেকেই ভারতীয় এবং বাঙালি জাতির প্রকৃত পরিচয় সন্ধানে উদ্যোগী হলেন। ১৩২৫ কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যার সবুজপত্রে সুনীতিকুমার "বাঙলা ভাষার কুলজী" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি ১৯১৮-র নভেমবর মাসের ঘটনা। এই প্রবন্ধে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের ভাষাতেই তার সংক্ষেপ হচ্ছে—

'বাঙালী জাতি হচ্ছে মূলত মিশ্র অন-আর্য জাতি, আর্য ভাষা আর আর্য সভ্যতা নিয়েছে মাত্র, তাও খুব প্রাচীন কালে নয়। বাঙলা ভাষার রীতি-নীতি হচ্ছে আর্যেতর উপাদান, অর্থাৎ—ধাতু শব্দ প্রভৃতি আর্য ভাষার, কাঠাম বা রূপ হচ্ছে অনার্য। বাঙলা ভাষার ঠিক ইতিহাসটি বার হলে যে জাতের মধ্যে এ ভাষার উদ্ভব, সেই বাঙালী জাতের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হবে। বাঙলা অনার্য-ভাষীর মুখে মাগধী অপভ্রংশ বদলে বাঙলা ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে। বাঙলা ভাষার চর্চায় প্রাকৃত সংস্কৃত পড়া দরকার, কিন্তু কোল-দ্রবিড়-বোড়োর চর্চাও বাঙালীর ভাষার আর জাতীয় উৎপত্তির আলোচনার পক্ষে খুব বিশেষভাবে উপযোগী। এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য।*

"বাংলা ভাষার কুলজী" প্রবন্ধ পড়ে রমাপ্রসাদ চন্দ ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের প্রতিভাতে সুনীতিকুমারের মতের প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রমাপ্রসাদ বাঙালী জাতিতে অন-আর্য মিশ্রণ স্বীকার করতে চান নি। তিনি মূলত গ্রিয়ারসনের মতেই বিশ্বাস করেন। গ্রিয়ারসন ভারতের আর্যজাতির

* সাংস্কৃতিকী ৩য় খণ্ডে (১৯৮২) সংকলিত 'আর্য-অনার্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আগমনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন, 'ইনার আরিয়ান' এবং 'আউটার আরিয়ান'। সুনীতিকুমার বাঙলায় বলেছেন 'ভিতরি' এবং 'বাহিরি'। বহু বছরের ব্যবধানে দুই পর্যায়ের আর্যদের ভাষার মূল এক হলেও পার্থক্যও ঘটেছে প্রচুর। রমাপ্রসাদ চন্দ মোটামুটি তাই মনে করতেন। আর্যভাষার মধ্যে যে অনার্য দ্রবিড় বা অন্য কোনো জাতির ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে, তা তিনি মনে করতেন না। সুনীতিকুমারের মতে ভারতীয় আর্যভাষায় বহু শব্দ আছে যার মূল ঋগ্বেদে বা ইন্দোইরানীয় ভাষায় নেই। এমন অনেক ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যার উৎস প্রাচীনতর সংস্কৃতে নির্ণয় করা যায় না, আবার এমন শব্দ এবং প্রয়োগ আছে যার সঙ্গে দ্রবিড় কোল বা মুণ্ডার মিল সহজেই অনুমান করা যায়। এসব বহু বিচারণার দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করতে অনুপ্রেরিত হলেন যে ভারতীয় জাতি অবিমিশ্র আর্য নয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালিদের মধ্যে একটা আর্যগৌরববোধ জেগে উঠেছিল, ভাষার ইতিহাসচর্চার দ্বারা সুনীতিকুমার তাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন।

ভাষার ইতিহাস অনুশীলন করতে-করতে আর-এক সত্যের দ্বার তাঁর কাছে খুলে গেল। শব্দ নিছক শব্দ নয়, ভাষা এবং শব্দ হচ্ছে আইডিয়ার প্রতীক। "পূজা" শব্দটা সংস্কৃত বলেই আমরা জানি অথচ বেদে এই শব্দ অথবা শব্দমূল নেই। তার থেকে এমন অনুমান সম্ভব যে পূজা নামক অনুষ্ঠানটি বৈদিক আর্যদের মধ্যে ছিল না। তাদের ছিল হোম যজ্ঞ। আর্য সভ্যতা পরবর্তিকালে আর-এক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পূজা প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করে নিয়েছিল। আর্য সভ্যতার সঙ্গে বহু অন-আর্যজাতির মিশ্রণ ভাষা দিয়েই প্রমাণ করা যায়। এই মিশ্রণের ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। ভারতীয় জাতির মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস, সংস্কার, ধর্ম, নীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অজস্র বৈচিত্র্য, এবং বৈপরীত্য দেখা যায়। কোন্ অনুষ্ঠান এবং সংস্কার শুদ্ধ আর্য, কোন্‌টা দ্রবিড় সভ্যতার দান, কোন্‌টা কোল বা অস্ট্রিক জাতি থেকে প্রাপ্ত এ তথ্য নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও ভারতীয় সভ্যতা যে বহুমুখী ধারায় গঠিত, এ সত্য আজ আর অস্বীকার্য নয়। সুনীতিকুমার ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করে বলেছেন,

'আর্য ও অনার্য—দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক—মিশিয়া, উত্তর-ভারতের (অর্থাৎ পাঞ্জাবের ও বিহার পর্যন্ত গাঙ্গ উপত্যকার) হিন্দু জাতিতে পরিণত হইল। আর্যের ভাষা ও আর্যের ধর্ম—বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্যেরা শিরোধার্য করিয়া লইল। অনার্যেরা আর্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্যের ধর্ম মরিল না, অনার্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগ-চর্যার তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল।'*

উত্তর-ভারতে কয়েক শত বৎসর যে প্রক্রিয়া চলেছিল, বাঙলাতেও চলেছে সেই প্রক্রিয়া—

'এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন এই নবসৃষ্ট আর্যভাষী বাঙালী জাতির জন্মনীড় হইল।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে সুনীতিকুমার যা বলেছেন, প্রায় ষাট বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" প্রবন্ধে তার সূচনা করে গিয়েছিলেন।** বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'বাঙালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য সন্দেহ নাই।' বঙ্কিমের

* জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ১৩৪৫।

** বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্গদর্শন পৌষ ১২৮৭, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

এই উক্তি আজ আর স্বীকৃত না হলেও আর্যদের বাঙলায় আসবার আগে এখানে অনার্যরা বাস করত এবং অনার্যদের মধ্যে প্রধান, কোল এবং দ্রবিড়-বংশীয়—এ সিদ্ধান্ত সত্য বলেই স্বীকৃত হচ্ছে। বঙ্কিম এসব কথা বলেছেন ডালটনের Ethnology of Bengal, হানটারের Statistical Accounts, Non-Aryan Dictionary Linquistic Dissertation প্রভৃতি গবেষণা এবং লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয় এবং মনুসংহিতা ইত্যাদি প্রাচীন সমাজশাস্ত্রের প্রমাণে। আর্য-অনার্য নির্ণয়ে ভাষাতত্ত্বও যে প্রধান উপায় এ কথাও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। বাঙালি মনীষীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেউ বোধহয় এভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আশ্রয় করে বাঙালির উৎপত্তিনির্ণয়ে চেষ্টা করেন নি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভেবেছিলেন ব্রাহ্মণরা বিশুদ্ধ আর্য—এটা আজকাল স্বীকার্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পরে সুনীতিকুমার বিষয়টিকে ভাষাতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক প্রমাণে বহু বিস্তৃত এবং তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের দ্বারা বৈজ্ঞানিক রীতিতে তথ্যগত প্রমাণ অবলম্বনে তিনি হিন্দু এবং ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। সুনীতিকুমারের এই ব্যাখ্যায় আমাদের আর্যত্বের গোঁড়ামি চূর্ণ হয়েছে; জাতিগত সংকীর্ণতা অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়েছে। পরমতসহিষ্ণুতা এবং উদারতার পথ প্রস্তুত হয়েছে। অবশ্য তিনি শুধু বাঙালির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেন নি, ভারতীয় সভ্যতার সর্বগ্রহণক্ষম উদারতার সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। জাতি হিসাবে ভারতীয় জাতির অনন্য বিশেষত্বটি বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় জাতি-সংহতি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। ভারতীয়রা একটি জাতি কিনা—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন অনেকেই। এ রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কারণ য়ুরোপে নেশন তত্ত্বের উদ্ভব। ভারতবর্ষে বর্তমান কালে আমরা বহু জাতি ও সংস্কৃতিকে দেখতে পাই। য়ুরোপে এক-একটা দেশে এক-একটাই জাতি ও সংস্কৃতি। এ কথা ভাবলে ভারতবর্ষকে একটা জাতি বলা যায় কিনা সন্দেহ। বহুজাতিকতার সত্যটিকে অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এই সত্যটিকে মর্যাদা দিয়ে জাতীয় সংহতির কথা কেমন করে ভাবা যায়, সমস্যা ছিল সেটাই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক দূর পর্যন্ত চিন্তা করেছিলেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ভারতবর্ষকে য়ুরোপীয় ইতিহাসের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে দেখলে চলবে না। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে রাষ্ট্র কোনোদিনই বড়ো ছিল না, সমাজই ছিল বড়ো। ইদানীংকালে ইংরেজ শাসনে রাষ্ট্রবন্ধনই বড়ো হয়ে উঠেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন 'ভারতবর্ষে একটিমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা'—রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এই প্রধান তত্ত্বটিকে সুনীতিকুমার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারতবর্ষে বহু বৈচিত্র্যের দ্বারাই একটি বিরাট ঐক্য সাধিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ "ভারতবর্ষের ইতিহাস" এবং অন্যান্য রচনায় এবং কবিতাতে এই ঐক্যের উপরে জোর দিয়েছিলেন। বস্তুত বিংশ শতাব্দীতে আমাদের চিন্তাধারার এই নবরূপই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জাতীয়তার প্রেরণা থেকেই জাতীয় সংহতি-চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। সুনীতিকুমার নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শক, হুন পাঠান-মোগলের জনস্রোতের সম্মিলনে ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছেন। সুনীতিকুমারের গবেষণার ফলেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্বটি আর কবির কল্পনাশ্রয়ী ব্যাখ্যা হয়ে থাকে নি।

ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে মিশিয়ে তিনি ভারতীয় সভ্যতার একটা চিত্র রচনা করেছেন। স্বভাবতই তাঁর মতো অনুসন্ধিৎসু জ্ঞান-সাধক এতেই তৃপ্ত রইলেন না। যাদের নিয়ে এই ভারতীয় সভ্যতা তাদের সম্বন্ধেও তাঁর অনুসন্ধান হল অপ্রতিরোধ্য। আর্য ছাড়া আর যেসব জাতি ভারতীয়

ভাষা এবং হিন্দু সভ্যতার মূলে ছিল, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয় না নিলে যেন ভারতীয় জাতিরও পুরো পরিচয় পাওয়া হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এইসব জাতি সবাই যে আর্যজাতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, তা নয়। দক্ষিণের দ্রবিড় আর্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ তৈরি হয়ে উঠেছে। ভক্তিধর্ম আমরা সেখান থেকেই পেয়েছি, নটরাজের কল্পনার উৎস ছিল দ্রবিড়দের মধ্যে, শঙ্করাচার্যের মতো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যেই। দ্রবিড়রা সভ্যতায় আর্যদের চেয়ে উন্নত ছিল বলেই সুনীতিকুমার মনে করেন—নগর-সভ্যতা তাদেরই সৃষ্টি। আজ আর তাদের আলাদা করে চেনবার উপায় নেই, একমাত্র ভাষার সাহায্য ছাড়া। অনেকে মনে করেন মহেনজোদড়ো দ্রবিড়দেরই কীর্তি। আর্যেরা দ্রবিড়দের উত্তর ভারত থেকে ঠেলে দিয়েছে দক্ষিণে। আজ বোধহয় দ্রবিড়দের কিছু লোক-সংস্কৃতি ও অনুষ্ঠান থাকলেও আর্য সংস্কৃতির ধারাই তাদের মূল ধারা। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে বৈদিক আর্যদের যদি বিশুদ্ধ আর্য বলা যায় তবে সে বিশুদ্ধতা আজ আর কোথাও নেই। অন্-আর্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আর্য সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে। সুনীতিকুমার এ বিষয় নিয়ে অনেক দিন থেকেই লিখছিলেন। ১৯৬৫ সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর তিনটি বক্তৃতা নিয়ে ছোটো একটি বই বের হয় *Dravidian*।

১৯৫১তে বের হয়েছিল *Kirata-jana-Kriti—The Indo-Mongoloids : their contribution to the history and culture of India*। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মঙ্গলয়েড জাতি; মহাভারতে এদের বলা হয়েছে কিরাত। আসাম, কোচবিহার, ভুটান অঞ্চলে এই জাতি এসে ভারতীয় জনসমষ্টির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ভারতীয় সভ্যতায় এদেরও দান আছে, কিন্তু এ নিয়ে সুনীতিকুমারই বোধহয় প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করলেন। এই বই আরম্ভ করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" কবিতার উল্লেখ দিয়ে যার মধ্যে কবি বহু মানবের ধারার ভারতমহামানবসাগরে এসে মিলিত হবার চিত্র রচনা করেছেন। এর কবিতার উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়, কবিকল্পিত বিচিত্র এবং একের তত্ত্বটিকে সুনীতিকুমারের তথ্যানুসন্ধানী মনটি কেমন করে গ্রহণ ও স্বীকার করে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে সুনীতিকুমারের যে অনুসন্ধিৎসা, সে ছিল রবীন্দ্রনাথের মননধারারই উত্তরাধিকার। সুনীতিকুমারকে দেখা যায় প্রথম থেকেই ভাষাতত্ত্বের গবেষণাসূত্রে ভারতের নানা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠতে। ১৯২৩-এই তিনি কোল জাতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছেন।* ১৯২৪-এ লিখছেন *Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilization*।** ১৯৭০-এ বাণীকান্ত কাকতি স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন *The Place of Assam in the History and Civilisation in India.*

এভাবেই সুনীতিকুমার একটি উদার মানসিকতার সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে বহুজাতির সম্মেলন হয়েছে বলেই এত বৈচিত্র্য। অথচ তিনি বিশ্বাস করতেন মূল ধারা 'ভারত'-সংস্কৃতরই ধারা, যদিও বহু পরিবর্তনের ও পরিগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। একদিকে বহু বিচিত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া আর একদিকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখা—এর মধ্যে কোনো বিরোধিতা আছে বলে তিনি মনে করতেন না। কেননা তিনি মনে করেন ভারতীয় সভ্যতার তিনটি বড়ো দান হচ্ছে সমন্বয়, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং অহিংসা।*** প্রাচীনতম কাল

* 'The Study of Kol', Calcutta Review, Sept. 1923।

** Modern Review, December 1924।

*** 'ভারতধর্ম ও হিন্দু যুবকের কর্তব্য', সাংস্কৃতিকী ৩য় খণ্ড (১৯৮২)।

থেকেই ভারতভূমিতে নানা সংস্কৃতির সমাবেশ ও সমন্বয় হয়ে চলেছে বলেই ভারতের অব্যাহতরূপে প্রবহমান জীবনচর্যা সমন্বয়ের সহজাত সংস্কার লাভ করেছে। তাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা পোষণ করাই হিন্দু নামক ভারতীয় জীবনাদর্শের লক্ষণ। যত মত তত পথ—এটা শুধু এ যুগের রামকৃষ্ণের কথা নয়, এটা চিরকালের ভারতীয় হিন্দুর কথা। সুনীতিকুমার অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে বলেছেন—

'যত দিন থেকে হিন্দু সভ্যতা বললে যা বুঝি, যে-মনোভাব, যে-চিন্তাপ্রণালী বুঝি, তা সৃষ্ট হয়ে রূপ ধরে মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভারতের আর্য আর অনার্যের সভ্যতা রীতিনীতি ধর্ম আর মনোভাবের অপূর্ব মিশ্রণের ফলে। আর আর্য ভাষা সংস্কৃত আর পালি প্রভৃতি তথা দ্রবিড় ভাষা তামিল ইত্যাদিকে অবলম্বন করে ক্রমে তার জ্ঞানগুলি আর তার শাস্ত্র জমাট বেঁধে উঠেছে, ততদিন থেকে ভারতের মনীষীদের মধ্যে চিন্তানেতাদের মধ্যে ভারতের আদিম আর পরবর্তী কালে আগত নানা জাতির সভ্যতা আর চিন্তাকে নিয়ে একটি বিরাট সমন্বয় করাবার চেষ্টা চলেছে।'

এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার বিদেশী পণ্ডিতদের শেখানো একটি মতকে অস্বীকার করছেন। ভারতবর্ষ কোনো কালে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে নি। নানা মত নানা আদর্শকে সে গ্রহণ করে নিজের জীবনধারার সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েছে। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে ভারতে একটা অবসাদ এসেছিল। সেই সন্ধিক্ষণেই ইসলামি সভ্যতা ও মতবাদ ভারতের জাতীয় চেতনাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। তিনি মনে করেন সমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, সকল জাতির সৎ প্রয়াসকে স্বীকার করে নেওয়ার মনোভাবই হচ্ছে সভ্যতার লক্ষণ। এ হচ্ছে ভারতধর্ম তা সে আগেই লাভ করেছে। 'আমরা হিন্দু বলে, হিন্দুর এই স্বাভাবিক মনোভাব জন্মগত অধিকার রূপেই পেয়েছি।' ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের একটা স্বাভাবিক গর্ববোধ ছিল। ভারতের এই হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে তিনি যে সমন্বয়ধর্ম লক্ষ করে এসেছেন, এর ফলে তাঁর চিন্তার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পায় নি। তিনি সাহস করে বলেছেন—

'আমার মনে হয় Indian first, Hindu afterwards এই বুলির দ্বারা অনুচিতভাবে বহু স্থলে হিন্দুকে তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। দেশভ্রাতাদের জন্য আমাদের স্বার্থত্যাগ করা কর্তব্য; কিন্তু যদি এই স্বার্থত্যাগ মানে আমাদের মনুষ্যত্ব বর্জন হয়, তা হলে আমাদের এরকমভাবে nationalism-এর সাধনায় কোনও ফল হবে না—বরং আমার সমাজের সমূহ ক্ষতি, আমাদের মানসিক নৈতিক আত্মিক অধোগতি।'*

আসলে সুনীতিকুমার হিন্দুত্বের গর্ববোধ করতেন, কিন্তু হিন্দুত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল ধর্মমোহ- ও সংকীর্ণতামুক্ত। হিন্দুত্ব বলতে তিনি বুঝতেন ভারতবর্ষের উদার সর্বগ্রহণক্ষম মানসিক আদর্শকে। বিশ শতকে হিন্দু-গৌরববোধ ঠিক মুক্তবুদ্ধি আধুনিকতার পরিচায়ক নয়। আমরা জাতীয় সংহতির প্রয়োজনকে সবার উপরে স্থান দিয়ে ধর্ম- ও সম্প্রদায়-চেতনাকে নিন্দনীয় বলেই মনে করি। সুনীতিকুমার সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হল, তাতে এই পণ্ডিত মনীষীকে চিন্তার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ বলে ভাববার কারণ নেই। হয়তো তাঁর চিন্তার যথার্থ প্রাসঙ্গিকতাই প্রকাশ পাবে। তিনি কোনো তত্ত্ব দিয়ে জীবনকে দেখেন নি। তিনি মানুষকেই জানতে ও বুঝতে চান যে-মানুষ ভারতীয় সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। সেই মানুষের স্বরূপ তিনি নির্ণয় করেছেন—নিজেকে তারই উত্তরাধিকাররূপে অনুভব করেছেন। হিন্দুধর্ম হিন্দু সমাজ এই মানুষের সৃষ্টি। তিনি যে

* ভারতধর্ম ও হিন্দু যুবকের কর্তব্য, 'সাংস্কৃতিকী (১৮৮২) পৃ ২১।

হিন্দুধর্মকে বিশ্বাস করেন সত্যানুসন্ধিৎসা এবং অহিংসা তার নিজস্ব সম্পদ। মানুষকে যেমন তিনি নির্বিশেষ কল্পিত তত্ত্বের মানুষ বলে ভাবতে পারেন না, একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত করেই তাকে চিহ্নিত করে নেন, তেমনি সেই সমাজকে সত্যের সন্ধানী, সমন্বয়-পরায়ণ এবং অহিংস বলেও তাকে উদার বলে তিনি ভাবতে অভ্যস্ত। আধুনিক চিন্তাভঙ্গির সঙ্গে এইখানে তাঁর যোগ।

সুনীতিকুমারের মধ্যে এই জাতিগর্ব ছিল। তার মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস ছিল না। তাঁর ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক লেখাগুলি যেমন যুক্তি- আশ্রয়ী, ইতিহাসবোধ- সমৃদ্ধ, তথ্যপূর্ণ, তাঁর স্বদেশধর্ম ও স্বদেশসংস্কৃতি বিষয়ক লেখাগুলি তেমনি গম্ভীর, বিশ্লেষণাত্মক এবং বিশ্বাসগাঢ়। তিনি আমাদের স্বাদেশিকতাবোধকে যুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছেন, তেমনি মোহমুক্ত উদার করে তুলেছেন। কূপ-মণ্ডুকতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেন নি বরং বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতি, জ্ঞানের বহুবিচিত্র শাখার প্রতি আমাদের কৌতূহলী করে তুলেছেন। বস্তুত সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্যের এটাই ছিল অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রাকরণিক বিষয় নিয়ে চর্চা শুরু করলেও সমগ্রভাবে মানুষের কীর্তি মনন এবং জীবনধারায় তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সে মানুষ ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা, য়ুরোপ—যে দেশেরই হোক। মানবিক কীর্তিতে সব মানুষের সঙ্গে সবার আত্মিক যোগ। বিশ্বমনস্কতার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর আশ্চর্য মিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গচেতনা থেকে ভারত-চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তার পরে পৌঁছেছিলেন বিশ্বচেতনায়। শেষ পর্যায়ে মানুষের এক নির্বিশেষ রূপও কল্পনা করেছিলেন। সুনীতিকুমারের চিন্তাতেও এই পর্যায়গুলি লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙলা, ভারত, ভারত- সংস্কৃতি, উপনিষদ প্রভৃতি মিথ্যা হয়ে যায় নি। সুনীতিকুমারের কাছেও তেমনি বিশ্বমনস্কতার প্রেক্ষাতেও বাঙলা, ভারত হিন্দুত্ব মিথ্যা হয়ে যায় নি। তুঙ্গনেই মানুষকে দেখেছেন বিরাট পটভূমিতে। সুনীতিকুমার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতির খুঁটিনাটি খবর রাখতেন ; ভাষার তুলনাত্মক আলোচনায় বহু দূরান্তরিত মানুষের মধ্যে ভাবের অব্যাহত যোগকে অনুভব করতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার ভাব-সূত্রটি তিনি যে-ভাবে বৈদিক উর্বশী সুফী বিশ্বপ্রিয়া এবং গ্রীক আফ্রোদিতের কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন, সত্যই তা বিস্ময়কর।* কাব্যরস আস্বাদনে আগ্রহী রসিকের কাছে এই অনুসন্ধান তেমন প্রয়োজনীয় মনে না হতে পারে, কিন্তু মানব-সংস্কৃতিকে যিনি অখণ্ড বলে ভাবতে পারেন তাঁর পক্ষে এটা প্রত্যাশিতই মনে হবে। এই ভাবসূত্রের সন্ধানে তাঁর মনে কোনো জাতিগত সীমাবদ্ধতা ছিল না। এইজন্যই তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগেও রামায়ণ নিয়ে মুক্তমনের সিদ্ধান্ত প্রচার করলে তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।* হোমারের কল্পনা থেকে সীতাহরণের কল্পনা এসেছে, এটা বলেছিলেন ওয়েবর। সুনীতিকুমারও এই মত পোষণ করেছেন। তাঁর মত রামায়ণ-ভক্তরা তো গ্রহণ করেনই নি, ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরাও অনেকে মেনে নেন নি। সুনীতিকুমার যে এই মতটি পোষণ করতেন তাঁর অবচেতন মনে মানব-সংস্কৃতির অখণ্ডতায় এবং ঐক্যে বিশ্বাস ছিল বলেই। তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকেই তাঁর দৃষ্টির বিশ্বব্যাপী প্রসার এবং কৌতূহলের নিদর্শন দেওয়া যায়। "সাংস্কৃতিকী" নামে তিন খণ্ডের বইতে এরকম নানা বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ সংকলিত আছে। 'যবদ্বীপের মহাভারত', 'রামায়ণ', 'তাণ্ড',

* সাংস্কৃতিকী প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

* এ-সম্পর্কে বিবরণ দ্রষ্টব্য, পল্লব মিত্র সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে সুনীতিকুমার' (১৯৮৫) বইতে দীনেশ-চন্দ্র সরকারের 'সুনীতিকুমারের রামায়ণ-চিন্তা' এবং শুভেন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায়ের 'রামায়ণ-বিতর্ক ও সুনীতিকুমার' প্রবন্ধ দুটি।

'সুফী অনুভূতি ও দর্শন' প্রবন্ধগুলিতে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের চিন্তাধারা অন্য দেশে গিয়ে নবজন্ম লাভ করেছে। "অলবীরুনী ও সংস্কৃত" প্রবন্ধটি সুনীতি-কুমারের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ যাতে ইসলাম-ধর্মাবলম্বী বিদেশী পণ্ডিতের ভারতীয় সংস্কৃতি-ভাবনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। মেকসিকোতে মায়া সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার যোগের সম্ভাবনা তাঁকে উৎফুল্ল করত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশ ও জাভা ভ্রমণের সময় দুজনাকেই দেখা যায় একই ধরনের কৌতূহল ও আগ্রহের বশবর্তী হতে। জাভা- বালিতে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার যে তাঁদের জাতীয়তার গর্বে গর্বিত করেছিল তা নয়, তাঁরা দুজনেই মানুষের কীর্তিকেই ছড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন। অবশ্য সুনীতিকুমারের মধ্যে ভারতধর্ম সম্বন্ধে (যাকে তিনি হিন্দুত্বের সঙ্গে সমার্থক মনে করতেন) সচেতনতা ছিল, কিন্তু সংকীর্ণতা ছিল না। মানুষের কীর্তিকেই তিনি দেশে-দেশে বিভিন্ন রূপে বিকশিত দেখতেই তাঁর আনন্দ। রাশিয়ার ইগোর গাথার সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। এরকম কত দেশের কত কাহিনী নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন লক্ষ করলে বিস্মিত হতে হয়। তা ছাড়া ইংরেজিতে *Africanism : the African Personality, Balts and Aryans in their Indo-European Background, India and Ethiopia* বইগুলি সুনীতি-কুমারের মানবমুখী কৌতূহলের নিদর্শন। তাঁর কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী "বৈদেশিকী", "ইউরোপ", "রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ", "যোরুবা দেশে" (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত) বইগুলি থেকে সুনীতিকুমারকে চেনা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে অভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন—

'আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা এবং টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই। তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত একথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটি একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মধ্যে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নিরন্ধ্র চিঠিগুলি একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম্। বর্ণনা সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত—লিপিবাচস্পতি কিংবা লিপি-সার্বভৌম কিংবা লিপিচক্রবর্তী।'

সুনীতিকুমারের রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'বিশ্বব্যাপারের প্রতি সজীব আগ্রহ' এসেছিল ভাষাতত্ত্বচর্চার পথে। সেই চর্চা তিনি সারা জীবনই করেছেন। অবশ্য ভাষা-রহস্য চিরকালই তাঁর কাছে ছিল বিস্ময়ের বস্তু। একজন কবি যেমন বিশ্বের সৃষ্টি দেখে আত্মহারা হন —'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।' ভাষার চর্চা তিনি করেছেন শিল্পচর্চার মতোই। প্রখর যুক্তিবাদী সুনীতি-কুমার শব্দবিশ্লেষণে মগ্ন হয়েও ছিলেন শিল্পরসিক। ভারতীয় শিল্পকলার তিনি শুধু অনুরাগী ছিলেন না, জাত-শিল্পার মতোই ছিল তাঁর সৌন্দর্যগ্রাহিতা এবং বিচারপ্রবণতা। মানুষকে তিনি জানতেন স্রষ্টারূপেই। ভাষাতত্ত্বচর্চায় এই ক্রিয়েটিভ অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত ছিলেন তিনি, এর আধুনিকতর পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হন

নি। আজকালকার তরুণ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা অনুযোগ করে থাকেন সুনীতিকুমার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেই লগ্ন হয়ে রইলেন—সস্যুর-প্রবর্তিত আধুনিক ভাষা-তত্ত্বে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। কথাটা সত্য। এই নতুন প্রণালী একটা যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাত্র।

While he valued the linguists who refined the methodology of Historical and Comparative Grammar and depending on their findings developed a general philosophy of language and while he would he prepared to use the words science and philosophy as synonymous he suspected that what had emerged as Modern Linguistics or Structural Linguistics was developing as a science at the cost of Linguistics itself.*

সুনীতিকুমারের মনীষা এতে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন ভাষাতত্ত্বচর্চা একাধারে আর্ট, দর্শন এবং বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুনীতিকুমারের মনীষার বৈশিষ্ট্য।

* R. K. Dasgupta, *Suniti Kumar Chatterji : Scholar* and *Humanist* : 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে সুনীতি-কুমার' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জী এবং গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য *Suniti Kumar Chatterji—The Scholar and the Man* (Jijnasa, 1970)

ড. ভবতোষ দত্তর জন্ম ১৯২৫ সালে ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট; বিশ্বভারতীর সাহিত্যভারতী। বিভিন্ন সরকারি কলেজে শিক্ষকতা, অধ্যক্ষতা এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর ১৯৭৮ সালে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদে বৃত হন। সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থমালা: "চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র", "বাঙালির সাহিত্য", "কৌতির্যশ", "রবীন্দ্র-চিন্তা-চর্চা", "বাঙালি-মানসে বেদান্ত", "রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গ", "বঙ্কিম-ভাবনালোক" ইত্যাদি।

ও শাঁখ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

শাঁখ, তুমি ওর মঙ্গল যাতে হয়, তাই ক'রো।
দূর দরিয়ায় নৌকো নিয়ে গেছে আমার প্রাণ
তুমি ওকে দেখো।
সেখানে জলের ওপর বিপজ্জনক ভেসে থাকা,
পায়ের তলায় মাটি নেই যে টেনে রাখবে।
সেখানে ডাঙা বলতে ওই ডিঙি
মোচার খোলার মতো লাট খায় নুনজলের ফেনায়।
ওই জলের নীচে
কাঁড়ি-কাঁড়ি মাছের ফসল মানুষকে টালায়,
ওই জলের নীচে তুমিও থাকো, শাঁখ,
তুমি অন্ধকারের মধ্যে স্থির শাদা আলো
তুমি নিশ্বাসের বায়ু
তুমি উদ্ধারের আঙুল।

আমি দূর গ্রামের বউ
ডান হাতে পরে আছি তোমাকে
তুমি ওর মঙ্গল যাতে হয়, দেখো।
ও আমার একমাত্র পুরুষ
আমার ঘাতক, আমার প্রাণ।

ভোর

কমল দে সিকদার

কাক ডাকলেই ভোর হয় না
অথবা মোরগ
যেমন ফুল ফুটলেই বসন্ত

আসলে ভোর হল একটা শুরু
অন্ধকার পেরিয়ে আসা

এর জন্য তো চাই প্রস্তুতি
চরিত্র আপোসহীন প্রতিরোধ

রঙবদলের নাম ভোর নয়
এমনকী কিছু পাইয়ে দেবার নামও

আসলে ভোর হল
অসুখ পেরিয়ে আসা
এক মুক্ত পৃথিবী

বিশ্বপাষাণে, গাজনে

দাউদ হায়দার

গীর্জা পেরিয়ে গেলেই
বসতবাড়ি, পাহাড়চূড়ায়—

যে-বাউল বলেছে সন্ধ্যায়
আমরা তার অতিথি এই জেলে-
পাড়ায়।
"ওই অসভ্য চণ্ডালিনী
বলেছে ভালোবাসি? মূলত ও ভিক্ষুণী,
এখানেই বাস। ওর চোখের পাতায়
ভৈরবী দীপ্তি, আর রুদ্র-মাথায়
শতাব্দীচিহ্ন। অবশ্য, কলঙ্করেখাও
বলতে পারো। অগ্নিযজ্ঞে দেখেছি, একা
ঘুরে-ঘুরে নাচছিল; তঙ্কুনি, দশদিগন্তে
ভয়াল অন্ধতা, যেমন শুরু ও অন্তে
আমাদের জীবন।"
বলে সেই বাউল খুব
হেসে ওঠে; যেন, দোহারপাড়ার চাঁদ ডুব
সাঁতারে মেতেছে বলটিক সাগরে।

চণ্ডালিনী তখন আমার দুই হাত ধরে
কেঁদে ওঠে,
"কী যন্ত্রণায় বেঁধেছ সংসার পাথরে
কবি? কী গৌরবে তুমি
বেছে নাও মৃত্যুভূমি?

"এসো, যাত্রা শুরু হোক, আজ
মাঘী-পূর্ণিমা, রাত্রির আকাশ জুড়ে চাঁদের কারুকাজ"

তখন ওরা
চড়লো ঘোড়া
সাত পাহাড়ে,
রংবাহারে
মাতলো গানে,
আকাশপানে
হাত বাড়িয়ে
চুল ছাড়িয়ে

বলে তোমার
ভালোবাসার
ঠিক-ঠিকানা
নেই কি জানা?

'আছে। মর্মর পাতায়, দুর্গম গিরিকান্তারে
সপ্তসিন্ধুতীরে, স্রোতগা পাথারে'

"তাহলে কেন কলঙ্করেখা ছুঁয়ে
এই অচেনা বিভুঁইয়ে?"

'কেননা ছায়া দেবে ভিক্ষুণী,
সুদীর্ঘ কল্যাণী-ছায়া'
"আর এই বাউলগৃহিণী
সাঙ্গাবে সমাধি, নাকি, উজ্জীবনে
রচিবে তমসা বিশ্বপাষাণে গাজনে?"

কৌতুক

শৌনক বর্ধন

ঘটাও দুর্যোগ তুমি দুষ্টমতি রঙ্গে
লালমাটি ন্যুব্জ হয় ক্রুদ্ধ অতিশয়
গোপনে কি প্রস্তুত রাখ দেহের সর্বাঙ্গে
ধুলট বারুদ কেন অগ্নিগর্ভ হয়।

ইতিবৃত্ত জান বলে মধ্যযামিনীর
নাচাও পাহাড়খাদে কাতর শৈশব
বৃন্তের আগায় ঝরে গন্ধকামিনীর
সে গন্ধ দুকূলে আনে অতুল বৈভব

কী রঙ্গ দেখাও তুমি নবজাগরণে
ঘূর্ণিস্রোতে টেনে আন রিক্ত ব্রাত্যজনে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা ও জাতীয় সংহতি

অশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা সম্পর্কে আজকাল অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ৫১(ক) ধারাতে ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হিসাবে বলা হয়েছে। সংবিধান প্রণয়নের সময় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের তালিকা ছিল না, শুধু নাগরিকের মৌলিক অধিকারের কথাই ছিল। সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রচলনের ২৫ বৎসর পর মৌলিক কর্তব্যের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংসদ যখন এই নতুন কথা অনুমোদন করেন তখন নিশ্চয়ই ধরে নিতে হবে যে ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় ঐক্য নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল, এবং সেজন্যই সচেতনভাবে নাগরিকদের এ বিষয়ে দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

এর বহু পূর্বেই অবশ্য "জাতীয় সংহতি পরিষদ" সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেখানে জাতির সংহতি, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিষয়ে আলোচনা এবং এ বিষয়ে প্রতিকূল শক্তিগুলির মোকাবিলা করার জন্য নানা পদক্ষেপের ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে, "জাতীয় সংহতি পরিষদে" আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি, এমনকী এসব আলোচনা নিতান্তই মামুলি ধরনের ছিল। তারপর সংবিধান সংশোধন করে নাগরিকের কর্তব্য হিসাবে জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতার উপর জোর দেওয়া হল। কিন্তু এই সাংবিধানিক সংশোধন কি যে-সকল নাগরিক ভারতের অখণ্ডতা এবং জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করছে তাদের মনের উপর কোনো শুভ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে? বরঞ্চ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এই সাংবিধানিক সংশোধনের পর যেন জাতীয় সংহতি এবং দেশের অখণ্ডতার উপর অভ্যন্তরীণ আক্রমণ আরও বেড়েই চলেছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার আগে কিছুটা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

করা দরকার।

"রাষ্ট্রের অখণ্ডতা" ও "জাতীয় সংহতি" : এই দুটো কথা আলাদাভাবে বিচার করা সংগত হবে। আমাদের ইতিহাস ও জাতীয়ত্বের কাঠামো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, এই দুটো ধারণার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাবে। ঐতিহাসিকরা একথা মানেন যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের দান ; আবার এটাও মানতে হয় যে, বিদেশী শাসন যে রাষ্ট্রীয় একতা সৃজন করেছিল সেই একতা তথা অখণ্ডতার বিভাজনও বিদেশী শাসনের কূটনীতির ফলেই হয়েছে ; সম্পূর্ণভাবে না হলেও, এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব বিদেশী শাসনের ছিল। কিন্তু এর পশ্চাতে রয়েছে আমাদের দেশের ইতিহাস, যেখানে রয়েছে জাতীয় সংহতির দুর্বলতার উৎস।

আমরা জানি—প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় একতা ছিল না ; সারা দেশে অনেকগুলো রাজ্য ছিল এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে (যদিও এইসব কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা বিতর্কের বিষয়) ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুগে মৌর্যবংশের সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলে ভারতের অনেকখানি অংশ এক-শাসনাধীন হয়েছিল। তবুও একথা বলা যায় না যে, ইংরেজ শাসনের আমলে ভারতের একরাষ্ট্রীয় আয়তন মৌর্যযুগে সম্ভব হয়েছিল। মৌর্যযুগের পর মধ্যযুগে মুঘল সম্রাটদের আমলে আবার ভারতের বিশাল অংশ একরাষ্ট্রীয় শাসনে এসেছিল, কিন্তু তবুও বলা যায় না যে সেই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ইংরেজ আমলের ভারতরাষ্ট্রের সমতুল্য ছিল। রাষ্ট্রীয় একতা তথা অখণ্ডতা ভারতের ইতিহাসের প্রধান সামগ্রী ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা না থাকলেও সমগ্র ভারত উপমহাদেশে এক অন্তর্নিহিত ঐক্যের সূত্র ছিল, যার প্রধান অবলম্বন ছিল ধর্ম এবং সংস্কৃতির বন্ধন। একথা উপলব্ধি করলেই রাষ্ট্রীয় একতা এবং জাতীয় সংহতির পার্থক্য বুঝতে পারা যাবে। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ছিল না, ছিল সমাজকেন্দ্রিক। সমাজবন্ধন মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের শাসনের চেয়েও বেশি সত্য ছিল, এবং এই বন্ধন রাজ্য দ্বারা সীমিত ছিল না।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠে যে, সমাজেও তো নানা রকমের ভেদাভেদ ছিল। সমাজ ছিল ধর্ম-কেন্দ্রিক, কিন্তু ধর্ম তো এক ছিল না। আদিযুগের তথাকথিত অনার্যদের সমাজ ও ধর্ম। তারপর আর্য-দের প্রবর্তিত ধর্ম যা কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্মে বা হিন্দু-ধর্মে পরিণত হল। তারপর জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, আরও পরে মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগের শেষভাগে ইসলামের প্রবেশ, শিখধর্মের আবির্ভাব। ইসলামের অনেক আগেই খ্রীষ্টধর্ম ভারতে এসেছে। সমাজ এবং ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করলেও জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে দুর্বলতার উৎস যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ধর্ম ছাড়া আরও একটি বড়ো কথা হচ্ছে এই যে, ভারতের জনসমষ্টি বহু জাতির সংমিশ্রণের ফল। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'শক-হুণ-দল-পাঠান-মোগল, এক দেহে হল লীন'। নানা জাতিকে এক-সূত্রে মিলিয়ে মিশ্র সংস্কৃতি ও জাতীয়ত্ব গড়ে তোলাই ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই মহান প্রয়াস ইংরেজ শাসনের শেষভাগে ব্যাহত হল, ১৯৪৭ সালের ভারতবিভাজন তারই পরিণতি।

মধ্যযুগে ভারতে—বিশেষত উত্তর ভারতে—হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম এবং সংস্কৃতির পরস্পর সংযোগে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে সহাবস্থান করার ফলে সাধারণ মানুষের স্তরে এক-রকম মিলেমিশে থাকতে শিখেছিল। আচার-আচরণে কিছুটা পরিমাণে দুই সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান হয়েছিল। প্রাক্-মুসলমান যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল। এই মিশ্রণের ধারা আরও চলতে থাকলে হিন্দু-মুসলমানের

বিভেদজনিত যে সমস্যা পরে দেখা দিয়েছে, ঐতিহাসিক বিবর্তন হয়তো সেরকম নাও হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ শাসনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের পার-স্পরিক সহাবস্থানের ধারা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। মধ্যযুগে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ছিল মুসলমান শাসন—সুদূর দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ছাড়া, এবং সেই ভিত্তিতেই হিন্দু সম্প্রদায় মোটামুটি নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সহযোগিতা ছিল। মুসলমান শাসকগণ এই দেশকেই তাদের দেশ বলে গ্রহণ করেছিল। সাধারণ মুসলমান শ্রেণীর অধিকাংশই এই দেশেরই মানুষ ছিল, বহিরাগত ছিল না। সুফী দর্শন ও ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দুই ধর্মের কিছু মৌলিক মিলনসূত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এই ধারা অব্যাহত রইল না। ইংরেজ শাসনে কিছুদিন থাকার পর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই মনোভাব বদলে যেতে শুরু করল। হিন্দু সমাজ প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হল। কিছু দেরিতে মুসলমান সমাজও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করল, কিন্তু অপেক্ষাকৃতভাবে পিছিয়ে রইল। তারপর যখন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হল, তখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোভাব তথা স্বার্থ-বিচারের পার্থক্য ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। সিপাহি বিদ্রোহ (অথবা ভারতের প্রথম ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াই) মুসলমান ও হিন্দুর সমবেত লড়াই ছিল। ইংরেজ শক্তিকে বিনষ্ট করে মুঘল সম্রাটের ক্ষীণশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই লড়াইয়ের লক্ষ্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে যখন নতুন করে আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মানুষের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হল, তখন থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশ এই চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হল যে ইংরেজ শাসনের অবসানের পর গণতান্ত্রিক শাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে না। দরিদ্র হিন্দু এবং দরিদ্র মুসলমান এদের স্বার্থ এক—ধনী হিন্দু, ধনী মুসলমান এদের স্বার্থ এক—এই ধরনের সামাজিক বিশ্লেষণ যাঁরা করেছেন তারা ধর্মের বন্ধন কতখানি জোরালো, তা উপলব্ধি করেন নি। অর্থনৈতিক স্বার্থের চেয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বার্থ বেশি প্রবল বলে প্রমাণিত হল। সেই সঙ্গে বিদেশী শাসকের কিছুটা প্রত্যক্ষ কিছুটা পরোক্ষ প্ররোচনা নিশ্চয়ই ছিল। সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে মিলে-মিশে থাকবার যে ধারা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তার প্রতিকূল ধারা আরম্ভ হল। এরই পরিণতি হল ভারতবিভাজনে, কিন্তু সেখানেই তার পরিসমাপ্তি নয়, ভারতবিভাজনের প্রতিক্রিয়া ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিলক্ষিত হচ্ছে, জাতীয় সংহতির পক্ষে এক বিরোধী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক প্রাচীর গড়ে উঠেছে। সেই প্রাচীর ভাঙবার জন্য প্রচেষ্টা শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক—সব স্তরেই চালিয়ে যেতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একথা বোধ হয় বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় একতা যদিবা রাষ্ট্রশক্তির জোরে রক্ষা করা সম্ভব হয়, জাতীয় সংহতি শুধু রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে বাঁচতে পারে না। ভারতীয় জাতি বলতে আমরা কী বুঝি ? এই প্রশ্নের কিছু আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় "জাতীয়ত্ব" বা জাতীয়তাবোধ বলতে আমরা যা বুঝি, সেটা পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও আধুনিক ইতিহাসের ব্যাপার। প্রাচীন বা মধ্য যুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে জাতীয়তাবোধের উপর কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রাচীন গ্রীসে ছোটো-ছোটো নগর-রাষ্ট্র, পরে আলেকজাণ্ডারের সৃষ্ট সাম্রাজ্য ; প্রাচীন রোমে প্রথমে নগর-রাষ্ট্র, পরে সাম্রাজ্য। ইউরোপে জাতীয়তা-ভিত্তিক রাষ্ট্র ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম

নেয়। রোমান চার্চের প্রভুত্বের যুগে জাতীয়তার চেয়ে এক ধর্মের ঐক্যসূত্রই বেশি প্রবল ছিল। যখন রোমান চার্চের বিরুদ্ধে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হল, সেই সময় থেকেই ইউরোপের দেশগুলিতে জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হল। একথা সুবিদিত যে, জার্মানি আর ইটালি জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোতে গঠিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এবং এই ঐতিহাসিক ঘটনা অনেকের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মৌলিক কারণ-বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এই যুক্তিতে যে এই দুটো জাতি দেখতে পেল যে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভের পূর্বেই অন্য অনেক ইউরোপীয় দেশ, বিশেষত ইংল্যানড আর ফ্রান্স, পৃথিবীর অনেকাংশ দখল করে বসেছে, এবং সূর্যের তলায় তাদেরও স্থান করে নিতে হবে।

সুতরাং এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীন বা মধ্য যুগে জাতীয়তাবোধ যে ছিল না—সেটা কোনো আক্ষেপের বিষয় নয়। মৌর্য যুগ বা মুঘল যুগে জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব নয়; কারণ, সেই বোধটাই সেই যুগে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। সে যুগে রাষ্ট্রশক্তি মানুষের জীবনের উপর সার্বিক প্রভাব স্থাপন করে নি, সমাজের একটা আলাদা অস্তিত্ব ছিল, এবং সমাজই মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা আর অনুশাসনের অধিকতর দায়িত্ব নিয়েছিল। বিদেশী শাসন ক্রমশ দেশে স্থাপিত হল। সমাজের—বিশেষ করে হিন্দু সমাজের বড়ো রকমের পরিবর্তন শুরু হল, রাষ্ট্রীয় শক্তি মানুষের জীবনে ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সমাজের বন্ধনকে কিছুটা দুর্বল করে দিল, সেই সঙ্গে আরম্ভ হল দেশকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করতে আমাদের জাতীয় আন্দোলন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ লিখলেন 'A Nation in the Making' অর্থাৎ ভারতীয় জাতি- সৃষ্টির সূচনা হয়েছে, সৃষ্টির কাজ চলছে।

সেই সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও চলছে। অনেক বাধা এসেছে, এর মধ্যে দেশ বিভক্ত হয়েছে, বিভক্ত দেশের যে অংশ এখন ভারত নামে চিহ্নিত, সেখানে অনেক প্রতিকূল শক্তির উদ্ভব হয়েছে যেগুলো জাতীয়তা-বোধকে সুদৃঢ় হতে দিচ্ছে না। মোটামুটিভাবে জাতীয়তার পরিপন্থী শক্তিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত, আলোচনা করা যেতে পারে ধর্ম অথবা ধর্মের নামে যে মৌলবাদের উদ্ভব হয়েছে, তা নিয়ে। মৌলবাদের উদ্ভব অবশ্য দুটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়েছে এবং এর ফলে যে ঐক্যবিরোধী দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল, সেই তত্ত্বের অশুভ প্রতিক্রিয়া বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে আবার নতুন করে জোরালোভাবে দেখা দিয়েছে। ভারতীয় কাকে বলা যাবে, ভারতীয়ত্বের সংজ্ঞা কী—এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিজন নিয়ে উদার ভারতীয় রাষ্ট্র ও ভারতীয় জাতীয়তার যে দর্শন স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল, তাকে যেন অধুনা অস্বীকৃতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

এই সঙ্গে ভারতের উত্তরাংশে আর-একটি ধর্মের নামে যে বিচ্ছিন্নতার ডাক উঠেছে, সে বিষয়েও আলোচনা করা দরকার। প্রধানত ধর্মের নাম করেই এই ডাক দেওয়া হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে আরও কয়েকটি কারণ জড়িত আছে যার মূল রয়েছে অর্থনীতি ও ভাষানীতিতে। আরও যুক্ত রয়েছে এই সঙ্গে একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন—কেন্দ্র ও রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক—যেটা পানজাব সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভারতরাষ্ট্র একটি রাজ্য-সঙ্ঘ; রাজ্য তার নিজস্ব একটি স্বকীয়তা দাবি করে; সংবিধানে তার স্বীকৃতি আছে অথচ সংবিধানেই সেই স্বীকৃতির বিরূপ বিধানও আছে। এ বিষয়ে পরে আর-একটু আলোচনা করা যাবে। একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, পানজাবের সমস্যা যতটা ধর্মের,

তার চেয়েও বেশি রাজ্য-কেন্দ্র-সম্পর্কের এবং ভাষাগত বিরোধের। পানজাবি আর হিন্দি ভাষা পানজাবে শিখ আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিভেদরেখা সৃষ্টি করেছে যা বোধহয় ধর্মের বিভেদের চেয়েও প্রবল। আর-একটি কথা মনে হয় যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে পানজাব যতটা দ্রুত এগিয়ে যেতে চায়, এবং এগিয়ে যেতে সক্ষম, সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের তালের সঙ্গে যেন মিল হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্রভাবে বিকাশের সুযোগ—অর্থাৎ কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যে সুযোগ ও স্বতন্ত্র বিকাশের স্বাধীনতা পেলে পানজাব আরও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, এবং সেই প্রগতির ফল সারা ভারত লাভ করতে পারে, তার অভাববোধ বিচ্ছিন্নতাবোধকে শক্তি যোগাচ্ছে, সমগ্র দেশের সংহতির মূলে আঘাত করছে।

দ্বিতীয়ত, আলোচনা করা যেতে পারে ভাষা-জনিত বিরোধ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এত ভাষার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। সংবিধান অনুযায়ী ১৫টি ভাষা স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবত আরও অনেক ভাষা এবং উপভাষা ভারত উপমহাদেশে আছে—পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাবে যে ভাষাসমূহ স্বীকৃতি পেয়েছে। সোভিয়েত সঙ্ঘ, কানাডা আর সুইজার-ল্যানডে বহু ভাষা প্রচলিত আছে, কিন্তু সংখ্যায় এতগুলি নয়। ভাষাগত বৈচিত্র্য জাতীয় সংহতির পরিপন্থী যাতে না হয় সেজন্য ইংরেজি ভাষাকে (যা সংবিধানের তালিকাভুক্ত ১৫টি ভাষার অন্যতম নয়) বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগরক্ষার ভাষা হিসাবে। উত্তর এবং পশ্চিম ও মধ্য ভারতের রাজ্য-গুলি ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দিভাষাকে আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে গ্রহণ করা হয় নি। ইংরেজি ভাষাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবহার করার নীতি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন। যতদিন এই নীতি চলবে ততদিন জাতীয় সংহতি ভাষার দিক থেকে আঘাত পাবে না। কিন্তু নীতিগতভাবে একটি বিদেশী ভাষার ব্যবহার আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের জাতীয় গরিমা ক্ষুণ্ন করেছে—একথা অনেকে মনে করেন।

হিন্দি আর ইংরেজি ভাষার এই বিশেষ গুরুত্ব ছাড়াও ভাষার দিক থেকে একটি সমস্যা উঠেছে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে। অবশ্য সেখানে ভাষার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যাও জড়িত আছে। সেই সঙ্গে আছে বিভিন্ন উপজাতির স্বাতন্ত্র্যবোধের সমস্যা। অসমে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে—তার পশ্চাতে আছে ভাষা, অর্থনীতি এবং নিজস্ব সত্তার স্বীকৃতির দাবি। নিজস্ব বাসভূমিতে যেন নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ছে—এইরকম মনোভাব অসম রাজ্যকে জাতীয় জীবনের মূলস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। বিগত এক দশক ধরে অসমে যে আন্দোলন চলেছে এবং এখনও চলছে, তার মোকাবিলা করতে আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব খুব যে সচেষ্ট হয়েছেন, তা মনে হয় না।

বিভিন্ন উপজাতির ভাষা আর সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনে একদিকে বৈচিত্র্য আর ঐশ্বর্য এনেছে, অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে এরা যেন মিলতে পারছে না। মূলস্রোতও যেন ওদের সহজে আপন করে নিতে পারছে না। এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্থক্য এই যে আমাদের ঐতিহাসিক ধারা ও সাংস্কৃতিক ঐহিহ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে নি; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তো আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থলেই বরাবর ছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক অংশই ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসে চিহ্নিত হয় নি। বর্তমানে ভারতের জাতীয়তার মূলস্রোতে

এদের মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়া বিশেষ প্রচেষ্টাসাপেক্ষ।

বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন উপজাতির সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের অর্থ নৈতিক বিকাশের স্তরবৈষম্য—এইসব দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে নবজাতীয়তার জন্ম হয়েছে, তাকে দৃঢ় এবং সুনিশ্চিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সুস্থ নেতৃত্ব এবং জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার অপেক্ষা রাখে। এ বিষয়ে আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। সেই ইতিহাস বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার অন্বেষণের ইতিহাস, সকল বিভিন্নতার মধ্যে মিলনের সূত্র আবিষ্কারের ইতিহাস। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার সঙ্গে হিংসা ও বিরোধ আমাদের ইতিহাসে যথেষ্ট ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তবুও একটা মৌলিক যোগসূত্র ছিল, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্বীকৃতি এবং শক্তি লাভ করেছে। দেশবিভাগ এই যোগসূত্রকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু দেশবিভাগের পর স্বাধীন ভারতে জাতীয়তাবোধ নতুন শক্তি পেয়েছে, নতুন রাষ্ট্রকে গড়ে তোলবার জন্য সার্বিক উদ্যম ও উদ্যোগের মারফত নতুন চেতনা এসেছে।

রাষ্ট্রশক্তি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রের শক্তি কোথায়? শুধুই কি সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা অখণ্ডতা রক্ষা করা যায়? রাষ্ট্রের শক্তি সমগ্র জনগণের শক্তি, জাতীয়ত্বের চেতনার শক্তি, সমগ্র দেশের মৌলিক স্বার্থ এক—এই অনুভূতির শক্তি। এই চেতনা এবং অনুভূতি জাতীয় সংহতির গোড়ার কথা। মধ্যযুগের অবসানের পর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে যখন জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ হয়, তখন প্রধানত ভাষা ও এক-জাতিত্বের ভিত্তিতে তা সম্ভব হয়েছিল। সেই সঙ্গে শিল্পবিপ্লব এবং ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন অর্থ নৈতিক কাঠামো জাতীয়তাবোধকে সুদৃঢ় করেছে। আজকাল রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার (সেকুলারিজম) যে ধারণা আমাদের দেশে অতি গুরুত্বপূর্ণ—পশ্চিম ইউরোপের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের এবং নবনির্মিত জাতীয় রাষ্ট্রের নীতিতে কিন্তু তা অবশ্য উপাদান ছিল না। রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ধর্মসংস্কার আন্দোলন জাতীয়তাবোধের পরিপূরক ছিল এবং সেই যুগে ধর্ম-বিরোধ এবং ধর্ম নিয়ে হিংসার উন্মত্ততা যথেষ্ট দেখা গিয়েছিল। ধর্ম এখন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাতীয় জীবনে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে না, কিন্তু আইন খুঁজলে দেখা যাবে ধর্মনিরপেক্ষতা আইনমাফিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয় নি অনেক দেশেই। ইংল্যানডে আইন অনুযায়ী অন্য ধর্ম দূরের কথা, খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও অ্যাংগ্লিকান চার্চ ছাড়া অন্য কোনো চার্চের ধর্মাবলম্বী সেদেশে রাষ্ট্রপ্রধান (রাজা বা রানী) হতে পারবে না। ভারতে কোনো সংবিধানিক পদই কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীর জন্য সংরক্ষিত নয়। সংবিধানের প্রগতিশীলতায় ভারতরাষ্ট্র পৃথিবীর অনেক দেশকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি মূলমন্ত্র। রাষ্ট্র সকল ধর্মকেই সমদৃষ্টিতে দেখবে, কোনো ধর্মকেই বিশেষ আনুকূল্য দেখাবে না। ধর্ম-নিরপেক্ষতার উপর অধুনা নানা দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা কী—এ নিয়ে বিতর্কের ধ্বনি উঠেছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেক নাগরিক তার ইচ্ছামতো ধর্ম পালন করবেন, ধর্মের জন্য তাঁকে কোনো নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না—এই নীতি শুধু নৈতিক আদর্শ হিসাবে নয় ব্যবহারিক পথ হিসাবেও অনুসরণে যদি রাষ্ট্র শৈথিল্য দেখায় তবে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হবে, সামগ্রিক-ভাবে দেশের প্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। কোনো রাজনৈতিক দল যখন ভোটলাভের আশায় বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে ধর্মীয় ভিত্তিতে আপোস বা সমঝোতা করেন—সে সংখ্যাগরিষ্ঠই হোক বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই হোক—তখন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে আঘাত করা হয়। কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে

যেসব রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতা পেয়েছেন, দল হিসাবে এবং সরকার হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের কাজে এই নীতির বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। তখনই সেই বিতর্কের ধ্বনি উঠে—প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা কী? এই কাজের পশ্চাতে কত ভাবের বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে?

আমাদের দেশ বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু জাতি-উপজাতির দেশ। এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোনো দেশেই নেই। এত বিভিন্নতার মধ্যেও আমরা নিজেদের মূলগত ভাবে এক বলে ভাবতে শিখেছি, এই এক ভাবাই আমাদের জাতীয়তার শক্তি এবং এই ভাবকে বাঁচিয়ে রাখা, আরও জোরালো করা আমাদের জাতীয়তার সাধনা হওয়া উচিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষ নিজেদের এক বলে ভাবতে শিখলেই তবে তারা এক জাতিতে পরিণত হয়। আধুনিক ইতিহাসে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে একদেশ একজাতি এ ভাবেই গড়ে উঠেছে। এই ভাব না থাকলে শুধু সেনাবাহিনী বা অস্ত্রবলে কোনো রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতার পরিপন্থী শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারে না। ইতিহাসে এর অনেক নজির পাওয়া যায়। অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী—যা সোভিয়েত সঙ্ঘ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে—প্রমাণ করে দেয় যে রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের মনে। সংযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্র মহা-পরাক্রমশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত, কিন্তু সঙ্ঘ হিসাবে অটুট থাকতে পারছে না। যে-সকল ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে সোভিয়েত সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল কালের বিবর্তনে সঙ্ঘের সেই ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছে। এর থেকে ভারতরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কিছু শিক্ষণীয় আছে নিশ্চয়ই।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে মোটামুটি কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। প্রথমত ধর্মনিরপেক্ষতাকে জাতীয় সংহতির প্রধান অবলম্বন হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সর্বস্তরে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উপযুক্ত মানসিকতা গঠন করতে সচেষ্ট হতে হবে। এ বিষয়ে শিথিলতা বা দোটানা ভাব জাতীয় জীবনে বিপদের সূচনা করবে। দ্বিতীয়ত, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যে বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ উঠছে সে সম্পর্কে গতানুগতিক সরকারি নীতি যে সফলতা লাভে অক্ষম হয়েছে তা স্বীকার করা দরকার এবং এই সমস্যাকে অনেক সমস্যার একটি না ভেবে জাতীয় জীবনের মূল সমস্যা ভেবে সার্বিকভাবে সমাধানের সূত্র খোঁজা দরকার। তৃতীয়ত, কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের সাংবিধানিক ভিত্তি নতুন করে বিচার করা দরকার। জাতীয় ঐক্য যেমন সত্য বলে মানতে হবে, জাতির বিভিন্নতাকে (বিচ্ছিন্নতা নয়) তেমনি সত্য বলে মানতে হবে। এই বিশাল দেশ ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিয়েই বেঁচে থাকবে। রাজ্যের স্বতন্ত্রতা রাষ্ট্রীয় একতার পরিপন্থী হবে না। ১৯৬২, ১৯৬৫, ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে যখন দেশ কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, জাতীয় একতা সমস্ত বিভিন্নতা ভুলে যায়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, রাজ্যকে একটি বিস্তৃততর সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ন্যস্ত করা এবং সেই সঙ্গে রাজ্যে পঞ্চায়েতি কাঠামো আরও শক্তিশালী করে সাধারণ মানুষকে ব্যবহারিকভাবে একথা উপলব্ধি করতে সুযোগ দেওয়া যে তারা সবাই ভারত রাষ্ট্রের অংশীদার—এই পথই হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির অনুকূল পথ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার অশোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবনের শুরুতে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। পরে যোগ দেন ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবায়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব ছিলেন। পরে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রপতির সচিব-পদে কর্মরত থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ঘর

কামাল হোসেন

শাঁখের আওয়াজ তুলে দ্রুত ছুটে আসে একটা রেলগাড়ি। মাথা ঘুরিয়ে দুজনে দেখেন। সাদা-সবুজ রঙের খেলনার মতো চলমান যন্ত্রযান। যেন রক্তের মধ্যে দোলা ছড়িয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যায়।

'রেলগাড়ি দেখলেই আমার খুব ভালো লাগে।' ছেলেমানুষের মতো মালতী বলেন।

অমরনাথ চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন। তখনো কানের পাশে ঝমঝম করে বাজে রেলগাড়ির ছুটন্ত আওয়াজ। চোখের সামনে উদাসীনভাবে বয়ে যায় বেলা। দিন। বছর। জীবন। বুকের ভিতরে সব সময় গম-গম করে একটা অদ্ভুত ধাতব প্রতিধ্বনি। সদ্য-চলে-যাওয়া এই রেলগাড়িটার সঙ্গে বুঝি তিনি মিলিয়ে দেখতে চাইছিলেন, সত্যি-সত্যি কোনো মিল আছে নাকি দু ধরনের আওয়াজের মধ্যে।

আকাশে ঘন বাদামি মেঘের আনাগোনা। একটা জমাট থমথমে ভাব চতুর্দিকে। সামনে একটা বড়ো সাদা রঙের জাহাজ নদীর জলের উপর দাঁড়িয়ে। আশেপাশে আরো কতকগুলো জাহাজ। নৌকা। মানুষজন। ঘাটে কয়েকজন স্নান করতে ব্যস্ত।

'এখানে নদীর জল কেমন যেন ঘোলাটে।' মালতী বলেন।

'আমাদের গাঁয়ের পাশে সেই রুপালি নদীটা ছিল বড়ো ছোটো। গরমকালে শুকিয়ে যেত।' অমরনাথ বলেন।

'সে নদীর জল ছিল আয়নার মতো। মুখ দেখা যেত।'

'তোমার সব মনে আছে নাকি?' অমরনাথের যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না।

'কেন, ভুলে যাব কেন? বুড়ি হয়ে গেছি বলে?' মুখ তুলে তাকান মালতী।

মাথার চুল সবটাই সাদা হয়ে গেছে। চোখমুখের চামড়ায় জরার নিপুণ প্রলেপ। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখলেই বোঝা যায় আজ আর কণামাত্র অবশিষ্ট নেই সেই আশ্চর্য যুবতী শরীরের অপার্থিব লাবণ্য।

অমরনাথের চোখের চাউনিতে কেমন অচেনা এক ধরনের বিষণ্ণতা লক্ষ করে অবাক হলেন মালতী।

'কী হল? হাঁ করে কী দেখছ?' কৌতুকের ঢঙে বলবার চেষ্টা করেন মালতী।

একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিলেন অমরনাথ। খানিক বাদে উদ্দেশ্যহীনভাবে চারপাশে তাকান। নদী। জাহাজ। বয়া। নৌকা। পুরুষ। রমণী···

'জবাব দিলে না?' কিছুটা ম্লান গলাতেই বুঝি মালতী আবার শুধান।

'কী আর বলব?' শুকনো মুখে একবার হাসবার চেষ্টা করেন অমরনাথ। তারপর হঠাৎ কী ভেবে একটু জোর দিয়েই যেন তিনি বলেন, 'তোমাকে অনেক কাল পরে এত কাছে মুখোমুখি দেখলাম, মালতী। অ-নেক দিন পরে।'

কথা বলার সুরে কোথায় যেন একটা দুঃখের বাষ্প ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশে।

'এতদিন বাদে বুড়ির মুখ দেখে কী মনে হচ্ছে বলবে না একটু?' মনে-মনে এরকম কিছু প্রশ্ন করবার ইচ্ছে থাকলেও মুখে কিছু বলতে পারেন না মালতী। এ ধরনের ছেলেমানুষি চিন্তা মাথায় আসাতে খুব অবাকও লাগছে তাঁর। নিজেকে নিয়ে এভাবে ভাবতে করে থেকে যেন ভুলে গেছেন তিনি।

বার্ধক্যের ঘুনপোকা নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে অমরনাথের শরীরেও। একদিন ঘুম থেকে উঠে তিনিও যেন আবিষ্কার করলেন কবে যেন সেই অচেনা জাদুকর তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে এক আশ্চর্য ফ্যাকাশে রঙের ছাড়পত্র। এর সাহায্যে এখন তিনি সহানুভূতি, করুণা কিংবা দয়াও ভিক্ষা করতে পারেন সংসারের আর-পাঁচটা সক্ষম মানুষের কাছে। এবং কী আশ্চর্য, এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের মতো তাঁর নিজস্ব পুরুষ-সত্তাকে কারা যেন কত সহজে কেড়ে নিয়ে গেল। এ ধরনের সব ভাবনা আজকাল মাথায় এলেই মনে-মনে হাহাকার করে ওঠেন অমরনাথ।

নদীর ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁরা।

হঠাৎ যেন কোনো মায়ামন্ত্রবলে এক রূপকথার রাজ্যে তাঁরা পালিয়ে এসেছেন। আজকে এতকাল বাদে এখানে আসার কথা ছিল না। তবু ইচ্ছে-অনিচ্ছের বাইরেও তাঁদের মতো সাধারণ সাদামাটা মানবজীবনেও কত কিছু অবাস্তব ঘটনা ঘটে যায়।

দুটি অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়ে রেললাইন পেরিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছিল।

মেয়েটির পরনে জিনসের প্যান্ট, সাদা শার্ট। একবার তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় বেশ সুন্দরী। ছোটোখাটো চেহারা। তুলনায় ছেলেটি বেশ ঢ্যাঙা। ছাই রঙের প্যান্ট, নানারকম ছাপওলা রঙিন শার্ট। মেয়েটির কাঁধে হাত দিয়ে সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে আসছিল ছেলেটি।

পৃথিবীতে এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে, মনে-মনে বিড়-বিড় করে বললেন অমরনাথ।

'ওমা, ওরা কোথায় হারিয়ে গেল বলো দেখি?'

সত্যিই তো, গাছপালার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে ছেলে-মেয়ে দুটি।

তার মানে মালতীও এতক্ষণ ওদের লক্ষ করছিলেন।

আর তখনই একটা সবুজ আর হলুদ রঙের রেলগাড়ি ঠিক যেন খেলনার মতো দুলতে-দুলতে নিজস্ব কক্ষপথ পরিক্রমায় শাঁখের আওয়াজ ছড়িয়ে হারিয়ে গেল কোন অপরিচিত ঠিকানায়।

মালতী আনমনা তাকিয়ে থাকেন নদীর দিকে। অমরনাথ অস্থিরভাবে একবার দেখছিলেন দূরে নদীর উপরে অর্ধসমাপ্ত সেতুর কঙ্কাল, এপাশে সবুজ বিশাল-বিশাল গাছ, নদীর ওপারে এই দ্বি-প্রহরের গনগনে উত্তাপে ধূসর কলকারখানা কিংবা বাড়িঘরের অলৌকিক অবস্থান।

'দেখো—দেখো, সেই ছেলে-মেয়ে দুটো।' মালতী বলেন।

যেন পাতাল ফুঁড়ে ওদের আবির্ভাব ঘটল জলের কিনারায়।

'তাই তো।' অমরনাথ বলেন। এসব জায়গার

গলিঘুঁজি তাঁদের কাছে নতুন হলেও ওই ছেলেমেয়ে-দুটি নিশ্চয়ই নিয়মিত এখানে আসে। ওদের কাছে সব চেনা।

একজন লুঙ্গিপরা মাঝবয়েসী মাঝি এসে দাঁড়াল তরুণ-তরুণীর কাছে। পাড় থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা নৌকা। দড়ি ধরেই সেটাকে পাড়ের কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসল মাঝি।

খিলখিল করে হাসছিল সেই তরুণী। একলাফে উঠল নৌকার পাটাতনের উপরে। কোমরে হাত দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল চারপাশে। ছেলেটিও ততক্ষণে উঠে পড়েছে নৌকার উপরে।

তারপর দুজনে ঢুকে গেল ছইয়ের ভিতরে। মাঝি একটা চটের পরদা টেনে দিল।

'এই নদী শেষ পর্যন্ত চলে গেছে সমুদ্দুরে। ভাবতেও অবাক লাগে।' গালে হাত দিয়ে মালতী বলেন।

'তোমাকে কখনো সমুদ্র দেখাতে পারি নি। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয়, তোমাকে নিয়ে দীঘাতে যাই। শুনেছি, সেখানে যেতে-আসতে খরচপাতি কম।' সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে অমরনাথ বলেন।

শব্দ না করে সামান্য হেসে মালতী বলেন, 'আর কোনোদিন আমাদের কোথাও যাওয়া হবে না।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন দুজনে।

'জাহাজে যারা চাপে, তাদের কত বড়ো কপাল। জলের উপর ভাসতে-ভাসতে কত দূর-দূর দেশে তারা যায়।' সামনে জলের উপরে অপেক্ষমান সাদা রঙের একটা জাহাজ দেখতে-দেখতে মালতী বললেন।

'হ্যাঁ, জলের জাহাজ—উড়োজাহাজ—কোনো জাহাজেই কখনো তোমাকে চাপাতে পারলাম না।' হতাশামাখা গলায় অমরনাথ বলেন।

'আহা, তার জন্য দুঃখু করার কী আছে? নাই বা হল আমাদের জাহাজে চাপা। এই বুড়ো বয়সে আর নতুন করে সাধ-আহ্লাদের কথা ভেবে মন খারাপ করার কোনো মানে হয়? আমাদের ছোটো খোকা তো উড়োজাহাজে চেপেছে।' মালতী বলেন।

অমরনাথ কিছু বললেন না। বলবার মতো কীই-বা আছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। চারটে ছেলে-মেয়ে ঠিকমতো মানুষ করতেই জীবনটা কিভাবে খরচ হয়ে গেল, এখন আর ঠিকমতো হিসেব কষে বলতে পারা সম্ভব নয়। খুব বড়ো কিছু স্বপ্ন দেখার সাহস কিংবা সামর্থ্য তাঁর কোনোদিনই ছিল না। এখনো নেই।

আকাশে বাদামি মেঘের আচ্ছাদন এর মধ্যে বেশ ঘন হয়েছে, ওঁরা এতক্ষণ খেয়াল করেন নি।

একটা ঠাণ্ডা ঝাপটা কোথা থেকে এসে লাগল দুজনের শরীরে।

বৃষ্টি এল।

খুব জোরে নয়। হালকা ধরনের ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি, শরৎকালের আবহাওয়ায় যেটা স্বাভাবিক।

মালতী বলেন, 'বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যে ভিজে যাব গো!'

অমরনাথ বলেন, 'আজকে অনেক কাল পরে ভিজতে ভারি ইচ্ছে করছে।'

'বুড়ো বয়সে ভিজে অসুখ করবে।'

'মাত্র একটা দিন। আবার আমরা সেই দুটি আলাদা-আলাদা খোপে বসে বকম-বকম করব। একসঙ্গে মুখোমুখি দুজনে বসে-বসে কতকাল এরকম নিরিবিলি গল্প করি নি বলো তো?'

মালতীর বুকের ভিতরের সেই পাখিটা যেন খাঁচার মধ্যে মাথা কুটে মরে। অমরনাথের কথার মধ্যে কী একটা ছিল, তাঁকে অযথা আকুল করতে থাকে। জরাগ্রস্ত ঠোঁটে হালকা রসিকতার প্রলেপ টেনে তিনি বলেন, 'কথার কী ছিরি! আমি কি তোমার পরস্ত্রী, যে ওভাবে কথা বলছ?'

'আমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী—এ খবরটা এতকাল বাদে তোমার হুঁশ হল?'

আর-একটা সবুজ আর সাদা রঙের খেলনার

মতো রেলগাড়ি ঝিকঝিক করে চরাচরে শাঁখের আওয়াজ ছড়িয়ে চলে গেল পাশের রেললাইন দিয়ে।

বৃষ্টির ঠাণ্ডা অনুভূতি দুজনে তাঁদের স্নায়ুর কোষে-কোষে খুব তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন।

মালতী মুখ তুলে তাকালেন। সামান্য বেদনামাখা গলায় বলেন, 'তুমি বাপু মাঝে ক'দিন খুব পাগলামি করলে। কী দরকার ছিল বলো তো?'

'পাগলামি? তুমিও তাই বলছ, মালতী'

'নয়? এই বুড়ো বয়সে!'

'বুড়ো বয়সে? কী বলছ তুমি নিজেও জান না। অবশ্য তোমাকে দোষ দিয়েই বা কী করব? নিজেদের নিয়ে ভাবতে কোনকালে আমরা ভুলে গেছি।' অমরনাথের গলা থেকে একটা চাপা হাহাকার বৃষ্টির সঙ্গে কাঁপা হাওয়ায় বুঝি ছড়িয়ে যায় চারপাশে।

বৃষ্টি ভিজিয়ে দিচ্ছিল দু'জনকে।

অনেকক্ষণ তাঁরা কেউ কথা বললেন না। বলতে পারলেন না। একটা শূন্যতা যেন চেপে ধরেছিল দুজনকে। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল অসহ্য যন্ত্রণায় বুকে হাত দিয়ে দুজনে বুঝি ভীষণ ঠাণ্ডা একটা অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলেন অনন্ত সময় ধরে। পায়ের হাঁটু ব্যথায় টনটন করছিল। বাইরে কোথায় যেন অস্পষ্ট ফিসফিস করে কারা কথা বলছিল। তাঁরা দুজনেই প্রাণপণে প্রবল আবেগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে চাইছিলেন। অথচ কী আশ্চর্য, এই নির্জন অন্ধকার ঘরে শীতের ঠাণ্ডায় জমতে-জমতে কবে থেকে যেন সত্যি-সত্যি তাঁরা পরস্পর-এর সঙ্গে কথা বলতে ভুলে গেছেন। হাজার চেষ্টা করেও কোনো মানবিক ভাষা তাঁরা স্মরণ করতে পারছিলেন না, যার সাহায্যে এতকাল বাদে দুটি মানুষ-মানুষী নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।

কেন যে এমন হয়! কত কথা বলতে ইচ্ছে করে, অথচ কত কঠিন এই পরস্পরের বোধগম্য একটা সহজ ভাষা খুঁজে পাওয়া।

বহু দূর থেকে খুব ক্লান্ত গলায় অমরনাথ শুধান, 'নৌকায় গিয়ে বসবে?'

'ছি ছি, কী লজ্জার কথা! তোমার মাথাটা দেখছি' সত্যিই খারাপ হয়েছে!'

'কেন, এতে লজ্জা পাওয়ার কী হল?'

'যে বয়সের যা—বোঝ না কেন?'

'বয়সের কথা বলছ?'

'আমরা তো এখন বুড়োবুড়ি। লোকহাসানোর কী দরকার?'

'এখানে চেনা লোক কোথায়?'

'তোমার বুঝি চেনা-অচেনা মানুষের জ্ঞান হয়েছে এতদিনে? তাহলে চেনা মানুষদের মধ্যে অত ছেলেমানুষি করার কী দরকার ছিল বলো তো?'

খানিকক্ষণ গুম হয়ে মনে-মনে কী যেন যুক্তি খুঁজে বেড়ান অমরনাথ। সেই ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়ার ঝাপটা এক অদ্ভুত কনকনে অনুভূতি এনে দিচ্ছিল মজ্জায়-মজ্জায়।

হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে অমরনাথ বলেন, 'অনেক কাল আগে একবার এরকম বৃষ্টিতে ভিজে-ছিলাম জান। ঠিক এরকম শরৎকালে—আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি দুপুরবেলায়। মাঠের মধ্যে দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ সারা আকাশ কালো করে বৃষ্টি। সঙ্গে ছিল আমার বন্ধু শম্ভু। শম্ভুর কথা মনে আছে তোমার?'

'গত বছর পুজোর সময় মারা গেলেন।'

'গলায় ক্যানসার···।'

'বিয়ের পর থেকেই দেখেছি, দুজনে যখন গল্প করতে, কী জোরে-জোরে হাসতে তোমরা! এখনো কানের পাশে যেন সেসব হাসির আওয়াজ শুনতে পাই।'

'আমার ছেলেবেলার বন্ধু।' ঝাপসা চোখে অমরনাথ যেন দেখতে পাচ্ছিলেন, পনেরো ষোলো বছরের দুই কিশোর গঞ্জের ধারে রুপালি নদীটির পাড়ে বটগাছের তলায় বসে গল্প করছে···

‘আড্ডা মারতে খুব তখন।’ কৌতুকমাখা গলায় মালতী বলেন।

‘সে এক বয়স। যা বলছিলাম—’

‘মাঠের মধ্যে দুজনে হাঁটছিলে। বৃষ্টি হচ্ছিল।’

‘হুঁ।’

‘আমাকে কত বার শুনিয়েছ তোমাদের এসব ছেলেবেলার গল্প।’

‘কবে শুনিয়েছি, মালতী? আমার তো মনে পড়ছে না।’

‘কতবার। বিয়ের পর তো দিন-রাত নিজেদের অল্প বয়সের গল্প শোনাতে। তোমার বন্ধুও বাপু খুব আমার পেছনে লাগত। শুধু ঠাট্টা আর রসিকতা। ওর বউ কমলাও ছিল ভারী মিশুকে। আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছল। সে বেচারাও কম বয়সে কী একটা অসুখে মারা গেল। বাচ্চাকাচ্চা ছিল না। বউ মারা যাওয়ার পর মানুষটা কেমন একা হয়ে গেল। এত করে আমরা বলতাম। তবু সে আর বিয়েই করল না।’

‘সব ভুলে গেছি। মাঝের পঁচিশটা বছর একটা দিনও কি তোমাকে এরকম একলা কাছাকাছি পেয়েছি, মালতী?’ বিড়বিড় করে বলে যান অমরনাথ। কান পেতে চুপচাপ শুনতে থাকেন মালতী। একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন অমরনাথ, ‘পঁচিশ বছর আগের দিনগুলোতে তোমার সঙ্গে কী গল্প করেছি, কীভাবে জীবন কাটিয়েছি, সব আমি কবে ভুলে গেছি, মালতী…’

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন মালতী। বিশ্রী কর্কশ গলায় বলেন, ‘করার কিছুই তো ছিল না আমাদের।’

প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারিটা হঠাৎ চলে যাওয়ার পর গঞ্জের মহাজনের কাছে খাতা লেখার কাজ নিয়েছিলেন অমরনাথ। বড়ো ছেলে সমর কলেজ শেষ করে ততদিনে কলকাতা কর্পোরেশনে কেরানির চাকরি পেয়েছে। দুই মেয়ে অঞ্জু, মঞ্জু আর ছোটো ছেলে বিমল তখন স্কুলে পড়ছে। কষ্টেসৃষ্টে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। সমস্যা হল মহাজন হঠাৎ মারা যাওয়ার পর। তার ছেলের পছন্দ হল না অমরনাথের কাজ। সুতরাং চাকরিটা গেল।

খবর পেয়ে গ্রামে গিয়ে সমর বাবাকে বোঝাল শুধু-শুধু গ্রামে মায়া বাড়িয়ে পড়ে থেকে লাভ নেই। অঞ্জু, মঞ্জু, বিমলের পড়াশুনো আর ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে।

অতএব চলো কলকাতায়। ঘটি-বাটি-গুটিয়ে আরো অনেক ভাগ্যসন্ধানী মানুষের মতো এই স্বর্ণ-নগরীর এক অন্ধকার ছায়া-ঢাকা কোণে অমরনাথ আশ্রয় নিলেন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে।

পুরোনো ড্যাম্প-লাগা স্যাঁতসেঁতে বাড়ি। দুটো মাত্র ঘর। এক ফালি বারান্দা। একটা ঘরে সমর বিমল। অন্য ঘরে অঞ্জু-মঞ্জুকে নিয়ে মালতী। বারান্দায় তক্তপোশের ওপর অমরনাথ।

এবং এভাবেই দেখতে-দেখতে যেন চোখের পলকে কেটে গেল পঁচিশটা বছর।

এই বছরগুলোতে অমরনাথের সাদামাটা মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্পও মোটামুটিভাবে একই রকম একঘেয়ে এবং নিরুত্তাপ। সম্বন্ধ করে সরকারি অফিসের কেরানির সঙ্গে অঞ্জুর বিয়ে দিলেন। বছর দুয়েক বাদে বিধবা হয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মেয়েটা ফিরে এল। সমর কাকে যেন ধরে-পাকড়িয়ে তাকে একটা প্রাইমারি স্কুলে ঢুকিয়েছে। মঞ্জুটা কিছুতেই বিয়ে করতে চাইল না। এখন মেয়েদের হাইস্কুলের দিদিমণি। দু বোনেই প্রচুর টিউশনি করে। সমর আর বিয়ে করল না। বিমল চার ভাইবোনের মধ্যে সব থেকে উচ্চাশী। কয়েকটা চাকরি পালটিয়ে এখন একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। আর একটু গুছিয়ে নিয়ে ও নিশ্চয়ই বিয়ে করবে।

ছোটোবেলা থেকেই চার ভাইবোনে নিজেদের একটা নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখে এসেছে। স্যাঁতসেঁতে ছোটো দুখানি ঘরে বাস করতে-করতে ভাড়াটে বাড়ির নানাবিধ অসম্মান সারা জীবন ধরে গায়ে মাখতে ইচ্ছে করত না তাদের।

পরিকল্পনাটা প্রথম এসেছিল বিমলের মাথায়। কলকাতায় চারিদিকে এখন ওনারশিপ ফ্ল্যাটের ধুম পড়ে গেছে। সুতরাং আমরাও সবাই মিলে একটা নিজেদের ফ্ল্যাট কিনব। বিমলের এক বন্ধু প্রোমোটারের কাছে পাওয়া গেল যাদবপুরের এইট-বি বাস স্ট্যানডের পাশেই একটা নতুন ফ্ল্যাটের সন্ধান। তারপর এল টাকার প্রশ্ন। সমর, অঞ্জু, মঞ্জু, বিমল—ওরা ওদের সবটুকু সঞ্চয় একসঙ্গে জমা করল। কিন্তু সে আর কতটুকু। কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপার। বিমল তার অফিস থেকে অনেক টাকা লোন জোগাড় করল। এল. আই. সি. এবং আরো কত জায়গা থেকে কীভাবে সব টাকা সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত তারা একটা নতুন ঝকঝকে ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছে, এটা ভাবলে সত্যিই এখন ভারি অবাক লাগে নিজেদের কাছে।

তিনখানা বড়ো শোবার ঘর। আলাদা বসার ঘর। খাবার জায়গা। সাজানো রান্নাঘর। চকচকে-টাইলস-বসানো শাওয়ার-কমোড-বেসিনের রূপকথার মোহ ছড়ানো স্নানঘর। গত পঁচিশ বছরের নিম্নমধ্যবিত্ত অভাববোধ কোনো জাদুমন্ত্রে যেন এক নিমেষে কোথায় হারিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর কী রকম আচ্ছন্ন গলায় মালতী বলেন, ‘ঠাকুর আমাদের এতকালের সব কষ্ট ধুয়ে-মুছে দিয়েছেন।’

বোধহয় ঠাট্টার সুরে অমরনাথ বলেন, ‘নতুন তিন তলার ফ্ল্যাটের গর্বে যে মাটিতে পা পড়ছে না দেখছি।’

‘কেন, গর্ব হবে না কেন? আমার নিজের পেটের ছেলেমেয়েরা কত কষ্ট করে কিনেছে।’

‘সে গর্ব করতে পার। কিন্তু ঠিক করে ভেবে দেখো তো, আমাদের দুজনের কি সত্যিকারের কোনো ঠাঁই আছে ওদের নতুন ফ্ল্যাটে?’ বিমর্ষ গলায় অমরনাথ বলেন।

গালে হাত দিয়ে অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে মালতী বলেন, ‘বুড়ো বয়সে তুমি কী রকম হিংসুটে হয়ে যাচ্ছ গো। ছি, ছি কী লজ্জার কথা, সেদিন অঞ্জু প্রথম আমাকে চুপিচুপি বলল, তুমি নাকি বলেছ, নতুন ফ্ল্যাটের একটা পুরো ঘর ছেড়ে দিতে হবে আমাদের বুড়ো-বুড়ির জন্য। শুনে আমিও খুব রাগ দেখাতে শুরু করলাম তোমার উপর। বুড়ো বয়সে এ কী ভীমরতি হল তোমার বলো তো?’

‘জীবনের এই শেষ দিনগুলোতে তোমাকে একটু কাছে পাব, এরকম চিন্তা করাকে তুমি ভীমরতি বলতে পারলে, মালতী?’ ক্লিষ্ট গলায় অমরনাথ বলেন।

‘ছি, ছি, কটা দিন ধরে কী পাগলামিই না করলে। বড়ো-বড়ো ছেলেমেয়েদের সামনে মাথাটা হেঁট করে দিলে গো!’

‘হ্যাঁ, দুই মেয়ের কাছে বসে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো তুমিও সমানে আমাকে গালমন্দ করে গেলে।’

বাষ্পাকুল চোখে তাকিয়ে থাকেন মালতী। বলেন, ‘কী করব বলো, এই বুড়ো বয়সে তুমি এমন করে আমাকে লজ্জায় ফেলবে, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবি নি।’

‘আমার কোন্ কথাটা তোমাদের কাছে দোষের হল শুনি? বললাম—দুই মেয়ে এক ঘরে থাকুক। দুই ছেলে এক ঘরে। আমরা বাপ-মা বুড়ো-বুড়ি এক ঘরে থাকি। এর মধ্যে কোথায় আমার ভুল হল, আমি এখনো বুঝতে পারছি না।’

‘তোমার কোথায় ভুল হচ্ছে বলব?’

মালতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন অমরনাথ।

ফ্ল্যাট তোমার পয়সায় কেনা নয়। ছেলেমেয়েরা কষ্ট করে নিজেরা তৈরি করেছে। ওরা ওদের নিজেদের সুবিধামতো সাজিয়ে গুছিয়ে থাকবে না?’

কিছুটা বিভ্রান্ত গলায় অমরনাথ শুধান, ‘আমি ছেলেমেয়েদের মানুষ করি নি?’

‘হ্যাঁ, করেছ। কিন্তু ওইটুকুই। বলো তো নিজের

সামর্থ্যে কোনোদিন পেরেছ মাথার উপরে একখানা চালাঘর তৈরি করতে?'

অপমানে কালো হয়ে যায় অমরনাথের বলিরেখা-অঙ্কিত তামাটে চোখমুখ। সেদিকে তাকিয়ে মালতীর চোখে জল এসে যায়। এভাবে তো মানুষটাকে অপমান করতে তিনি চান নি।

ধীরে-ধীরে অবসন্ন গলায় অমরনাথ বলেন, 'না—তা অবশ্য পারি নি। কীভাবে মানুষ অনেক টাকা হাতে পায়, সে রহস্যের উত্তর কোনোদিন ভালোভাবে জানা হল না।' কত কথা মনে ভেসে আসছিল। বাবা-মা মারা গেছলেন ছোটোবেলায়। জ্যাঠা-কাকার একান্নবর্তী সংসারে মানুষ। উপেক্ষা, অনাদর আর অপমান মুখ বুজে সহ্য করে বড়ো হতে হয়েছে। অল্প কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পেয়ে গঞ্জে চলে আসেন। অল্প মাইনে। তো সে আমলে তাই অনেক। বামুন-পাড়ায় একখানি ছোট ঘর ভাড়া নিলেন। সহকর্মী মালতীর বাবার পছন্দ হয়েছিল এই নবীন শিক্ষককে। অমরনাথের সংসারে একে-একে এল অমর, অঞ্জু, মঞ্জু আর বিমল। আত্মময় ভঙ্গিতে অমরনাথ বলেন, 'ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, ঘরভাড়া, কাপড়-চোপড়—আমার সামান্য রোজগারে সব দিক সামলিয়ে কীভাবে সংসার চালিয়েছি, তা কি আজ তোমাকে নতুন করে মনে করাতে হবে, মালতী?'

'না-গো, তোমাকে আমি ছোটো করতে চাই নি। রাতদিন কত কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছ, সেসব কি আমি জানি না?' মালতী সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলেন।

'তবু ভালো, ছেলেমেয়েরা নিজেদের জন্য একটা নতুন ঘর তৈরি করতে পেরেছে।' নিরুত্তাপ গলায় অমরনাথ ঠিক যেন টিভির সংবাদপাঠকের ভঙ্গিতে একই সংবাদ শেষবারের মতো আবার পাঠ করলেন।

'আমার ছেলেমেয়েরা সবাই খুব পরিশ্রমী।' শান্ত গলায় বলেন মালতী, 'তুমি ওদের ভুল বুঝো না। ওরা আমাদের কতখানি ভালোবাসে, সেটা তুমি বুঝতে পার না? আমাদের কারোর এতটুকু কিছু অসুখ-বিসুখ হলে চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডাক্তার-কবিরেজ ডেকে যতক্ষণ না সুস্থ হচ্ছি ওদের স্বস্তি হয় না। আজকালকার কটা বাপ-মা এতটা যত্ন-আত্তি পায় বলো তো ছেলেমেয়েদের কাছে?'

'ঠিক আছে, আমাদের না দিক, বড়ো খোকাকেই একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত। বেচারা সারাটা জীবন কীভাবে পরিশ্রম করল। চোখের সামনে বুড়িয়ে গেল। ও একটু শান্তি পাক।'

'কী যে পাগলের মতো কথা বল। তুমি তো জান, ফ্ল্যাটটার যোগাড়যন্ত্র থেকে শুরু করে সবকিছু ছোটো খোকার কেরামতি।'

'হুঁ।' আনমনা গলায় অমরনাথ বলেন। মালতীর কথা তিনি মন দিয়ে শুনছেন কিনা ঠিক বোঝা যায় না।

'এই শোনো, আমি কিন্তু এবার ভেবে রেখেছি, ছোটো খোকার বিয়ে দেব। একটা ছেলে তো সংসার সামলাতে গিয়ে আইবুড়ো থেকে গেল।'

'ছোটো খোকা রাজি আছে?'

'অরাজি তো মনে হয় না। অঞ্জু বলছিল, ছোটো খোকার একটা পছন্দের মেয়ে আছে। ওদের আপিসে চাকরি করে। তবে বাপু বলেই রাখি, তখন আবার পাগলামি করবে না, মেয়েটা কিন্তু খ্রীষ্টান।'

'ও—এত সব ঠিকঠাক হয়ে আছে ভিতরে-ভিতরে। আমাকে তুমি তো একটা কথাও কোনোদিন বল নি।'

'কখন বলার সময় পাব বলো?' মনে-মনে প্রতিদিনের রুটিনটা বোধ হয় ঝালিয়ে নিতে চাইলেন মালতী। সকাল থেকে তাঁকে রান্নায় ব্যস্ত থাকতে হয়। সংসারের কত কাজ। ভোরবেলায় অঞ্জু যায় স্কুলে। নটা বাজতে না বাজতেই বাকি তিনজনের কাজে যাবার তাগাদা। ওরা বেরতে না বেরতেই অঞ্জু ফিরে আসে। দুপুরে বিকেলে রাত্রে ছাত্রীরা আসে টিউশনি পড়তে। ছেলেমেয়েদের সময়মতো খাওয়া-

দাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা সবকিছুর দিকে অষ্টপ্রহর নজর রাখতে হয় মালতীকে। মুখ টিপে হেসে তিনি বলেন, 'জোয়ান ছেলেমেয়েদের সামনে বুড়োবুড়ির নিজেদের ইচ্ছেমতো গল্প করা সম্ভব নাকি।'

'সেজন্যই তো আমি একটা আলাদা ঘর চেয়েছিলাম, মালতী। কতকাল আমরা একসঙ্গে বসে মুখোমুখি গল্প করি নি। কতকাল আমরা এক বিছানায় পাশাপাশি শুই নি। কতদিন তোমাকে ছুঁয়ে দেখি নি, মালতী!'

'আমার এই বুড়ি শরীরে আর কিছু বাকি আছে নাকি?' ঠাট্টা করে মালতী হাসেন, 'নিজেকে আর মেয়ে-মানুষ বলে চিনতেই পারি না। বুক-পাছা সব ল্যাপা-পোঁছা হয়ে গেছে। এ বয়সে এরকম দূরে-দূরে থাকাই ভালো। খুব কাছে এলে শুধু-শুধু দুঃখ বাড়ানো।'

'তুমি আমাকে কিছুই বুঝলে না, মালতী। পুরুষের ক্ষমতা আমার দেহেও তো এখন কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু দুজন পুরুষ আর নারীর সম্পর্ক কি শুধু শরীরের হিসেব মিলিয়েই চলতে থাকে? তার বাইরে আর কিছু নেই?'

মালতী কাঁদতে থাকেন।

'জান, তোমার ছোটো ছেলে আমাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলেছে।'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ গো, সত্যি। আমি নিজের কানে শুনেছি। কাল রাত্তিরে ছোটো খোকা বলছিল বড়ো খোকাকে—বাবা বড়ো বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছে। এবার সত্যি-সত্যিই একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে।' কাঁদতে-কাঁদতে বলতে থাকেন অমরনাথ, 'বলো মালতী, তুমিও বলছ পাগল, ওরাও বলছে পাগল। জান, দরজার ওপাশ থেকে ছোটো খোকার কথা শুনে আমার বুকের ভিতরটা কেমন আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। যদি ওরা আমাকে বাঁচিতে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়। এখানে তবু তোমাকে, ছেলে-মেয়েদের সকলকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে পাগলদের মধ্যে একা-একা কীভাবে থাকব মালতী? ক'দিনই বা আর বাঁচব বলো তো?'

'তোমাকে তো তাই বার-বার করে বোঝাচ্ছি, আলাদা ঘরে থাকার ওসব উলটোপালটা চিন্তা আর মাথায় এনো না।'

'আনব না। সত্যিই তো, এ বাড়ি আমার পয়সায় তৈরি না। এখানে আমি কোন্ অধিকারে একখানা ঘর চাইব, যেখানে তোমাকে নিয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারব।'

দুজনেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। ঝিপঝিপে বৃষ্টি তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ এর মধ্যেই বেশ ভিজিয়ে দিয়েছে।

ব্যগ্রভাবে হঠাৎ অমরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি একবার বুকে হাত দিয়ে বলো তো মালতী, তোমার মনেও এতটুকু ইচ্ছে হয় না আমার সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে? নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলো না, মালতী।'

মালতী কাঁদতেই থাকেন। যেন নতুন করে আর কীই বা স্বীকারোক্তি করবেন।

'যদি সত্যি এখনো আমার দেহে বাড়তি ক্ষমতা থাকত, সেরকম কিছু উপার্জন করতে পারতাম, তাহলে তোমাকে নিয়ে চলে যেতাম আমার ছেলে-বেলার গ্রামে। সেখানে আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের পাশে একটুকরো জমি কিনে ছোট্ট একটা খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর বানাতাম। উঠোনের একপাশে কয়েকটা ফুলের গাছ। হাসনুহানা, কামিনী, জুঁই, গন্ধরাজ। বাড়ির পেছনে কয়েকটা ফলের গাছ। আম। কাঁঠাল। কলা। মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্নার রাত্তিরে উঠোনে মাদুর পেতে বসে আমরা আমাদের অল্প বয়সের গল্প করতাম।' অমরনাথ বলেন।

'কেন দুঃখ পাচ্ছ? এসব তো কিছুই কোনোদিন হবে না আমাদের জীবনে।' মালতী বলেন।

'সত্যি, নতুনভাবে কিছু করার ক্ষমতা আর নেই আমাদের।'

বড়ো অদ্ভুত আর ভয়াবহ সেই শূন্যতা আবার গ্রাস করে দুজনকে। বাইরে চারদিকে বুঝি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। এক ভয়ংকর জতুগৃহের মধ্যে দুজনে দাঁড়িয়ে খুব নিশ্চিতভাবে তাঁরা বুঝি অপেক্ষা করে শুনছেন আড়ালে দূরে ভেসে আসা জীবনের ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি···

অনেকক্ষণ পর অমরনাথ বলেন, 'ভাগ্যিস আজ জোর করে তোমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছলাম।'

'আর ডাক্তার দেখানোর পর তোমার মাথায় ভূত চাপল, একা-একা দুজনে নদীর ধারে পালিয়ে গিয়ে বসব!' মালতীর ঠোঁটের কোনায় সেই বহু পরিচিত অথচ হারিয়ে-যাওয়া তরুণীর হাসি আবিষ্কার করে শিহরণ বোধ করেন অমরনাথ।

ব্যগ্রগলায় তিনি বলেন, 'মালতী, একবারটি কথা শোনো, কিছুক্ষণের জন্য নৌকায় গিয়ে বসবে? কবে বাঁচি-মরি—আর হয়তো কোনোদিন কাছে পাওয়ার এরকম সুযোগই আসবে না আমাদের জীবনে।'

রহস্যময়ী চোখে মালতী তাকিয়ে থাকেন। কিছু প্রতিবাদ করার ভাষাই বুঝি খুঁজে পেলেন না।

একজন মাঝিকে ডাকেন অমরনাথ। পঞ্চাশ টাকা ঘণ্টা। দরদস্তুর করে দুজনে কোনো রকমে উঠে বসলেন নৌকার মধ্যে।

ছইয়ের ভিতরে যেন প্রাগৈতিহাসিক আলো-আঁধারি।

'পরদা নামিয়ে দেব?' অমরনাথ শুধান।

'কী দরকার। খোলা থাক। ঠাণ্ডা হাওয়া আসবে।' লজ্জা-পাওয়া গলায় মালতী বলেন।

'একটু প্রাইভেসি পাব বলে পয়সা খরচ করে এক ঘণ্টার জন্য এখানে এসেছি, মহারানী।' সমর্থ পুরুষ মানুষের মতো ছইয়ের পরদা নামিয়ে দিলেন অমরনাথ।

বাইরে থেকে কে যেন ঠাট্টা করে বলে, 'আজকাল শালা বুড়ো-বুড়িরও কম রস নেই!'

প্রত্যুত্তরে কে কী বলল সেদিকে কান পাতার প্রয়োজন মনে করেন না দুজনে।

'তোমার হাতখানা একটু দেবে মালতী, বড়ো ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।'

জরাগ্রস্ত হাতখানা বাড়িয়ে দেন মালতী।

খুব শান্তভাবে মালতীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরে কাঁদতে থাকেন অমরনাথ।

তারপর চরাচরে জ্যোৎস্না নামে। ফুল ফোটে। হরিণের পায়ের শব্দ হয় শুকনো পাতায়। দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় পরস্পরকে নিঃশেষ করে জীবনের উত্তাপ খুঁজতে থাকেন দুজনে।

মালতীর মাথার সাদা চুলের মধ্যে মুখ গোঁজেন অমরনাথ। সম্ভবত কোথায় কোনো পাখি ডাকে।

আস্তে-আস্তে গল্পের গাছপালাগুলো স্পষ্ট হতে থাকে অমরনাথের চোখের সামনে।

'তোমার মনে আছে মালতী, সেই যেবার পাঁচ বছরের ছোটো খোকার জল-বসন্ত হয়েছিল, এরকম নৌকায় করে নদী পেরিয়ে মহাদেবগঞ্জে গিয়ে গাজীবাবার মাজারে মানত করে এসেছিলাম।'

অমরনাথের বুকের মধ্যে মুখ রেখে মাথা নাড়েন মালতী।

নৌকার পাটাতন দুলতে থাকে। বৃষ্টির ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস একটা অলৌকিক শান্তি ছড়িয়ে দিতে থাকে নৌকার ভিতরে।

আর তখনই, বাইরে সেই রূপকথার রেলগাড়িটা শাঁখের আওয়াজ ছড়িয়ে বুঝি দূরে কোথায় চলে যায়। চোখের সামনে তাঁরা দেখতে থাকেন, সেই খেলনার মতো রেলগাড়ির একটা ছোটো কামরায় মুখোমুখি বসে আছেন দুজনে। হাসেন। গল্প করেন। রসিকতা করেন। জানলা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে মালতী হয়তো দূরে কী যেন একটা দেখান—নদী কিংবা হ্রদ কিংবা পাহাড়···

ছইয়ের মধ্যের ঘেরাটোপে বসে এই দুই আদিম পুরুষ আর রমণী কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন সেই দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনিপুঞ্জ।

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির

সুধীর চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লালন ফকির যে সময় কুষ্টিয়া আর তার সন্নিহিত অঞ্চলে জীবনসাধনা ও লৌকিক ধর্মবুদ্ধিবহুল গান-সৃজনে রত তার সমসময় কলকাতাকেন্দ্রিক নব-জাগরণের মধ্যাহ্ন। লালনের তিরোধান ১৮৯০ সাল। তার মানে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের উন্নতচেতনা, ধর্মসমন্বয়, স্বাদেশিকআবেগ সারাদেশের উচ্চ ও মধ্যবর্গের সমাজে সাড়া তুলেছে ইতিমধ্যে। আত্মবিকাশ আর আত্মপ্রকাশ, নবচেতনার এই দুই লক্ষণ তখন এলিটিস্ট সমাজে খুব সক্রিয়। তার একটি বড়ো চিহ্ন রয়ে গেছে বাঙলা উনিশ-শতকীয় আত্মজীবনীসাহিত্যে। দেবেন্দ্রনাথ থেকে অনেকেই আত্মজীবনী রচনায় তৎপরতা দেখিয়েছেন এই পর্বে। মধ্যযুগে ছিল রাজামহারাজানবাবাবদশা কিংবা মহান্তমহাজনদের জীবনীরচনার বহুল আয়োজন, আধুনিক যুগে এল আত্মজীবনের বিবরণ রচনার নতুন প্রবণতা। পাশ্চাত্য এক কলাবিদ্ লিখেছেন য়ুরোপে পোট্রেট থেকে সেল্ফ-পোট্রেট রচনায় যে রকম অন্তর্লীন উত্তরণ ঘটেছিল শিল্পক্ষেত্রে, সাহিত্যেও তেমনই বায়োগ্রাফি থেকে অটো-বায়োগ্রাফির দিকে যাওয়া এক নবচেতনার প্রবণতা। এ-কথার অন্তঃসার আমরা যদি উনিশশতকীয় বাঙলা সমাজে প্রয়োগ করি তবে শহর কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিতবর্গে আত্মজীবনী রচনার অজস্র নমুনার ব্যাখ্যা পাই। কিন্তু ওই একই কালপর্বে কুষ্টিয়ার লালন ফকিরকে দেখি এক নিগূঢ় আড়াল রচনায় তৎপর। সেইজন্য ১৮৯০ সালে তাঁর প্রয়াণের মাত্র এক পক্ষকালের মধ্যে তাঁর সাধনক্ষেত্র ও বসবাসের স্থান কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত "হিতকরী" পত্রিকা অসহায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখে :

> ইহার জীবনী লিখিবার কোনো উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।

সদ্যপ্রয়াত একজন বহুমান্য লৌকিক সাধক সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে এমন যে উপকরণহীনতা তার মূলে ছিল ভারতীয় গুহ্য সাধনার বিশেষ ধরন। আত্মসাবধানী আমাদের মগ্ন উপাসক সম্প্রদায়ের একটা অতিপ্রচলিত অনুজ্ঞা ছিল—

আপন সাধনকথা না কহিবে যথাতথা।
আপনার আপনি তুমি হইও সাবধান।

এখানে 'যথাতথা' বলতে বেদরদি অমর্মজ্ঞ মানুষের কথাই বোঝানো হচ্ছে। গুহ্য সাধনতন্ত্রের যে লোকায়ত অন্তর্গোপন ধূসর জগৎ সেখানে সাধক এবং সাধ্যের মধ্যে তাই ইচ্ছা করে গড়ে তোলা হয় নানা মিথ কিংবা ছল। মুখে-মুখে রটে যায় নানা কিংবদন্তী বা অলীকপুরাণ। লালন ফকির যে এমন এক চেষ্টিত আত্মলোপের ঐশী খেলায় মাতেন নি তা আজ কে বলবে?

তার ফলে, অনুমানসম্বল বা জনশ্রুতিবহুল একাধিক কাহিনী তাঁর নামে চলে আসছে। অনুমানে রঙ চড়ানো হুজুগে বাঙালির রক্তগত স্বভাব। সে স্বভাব আজও সক্রিয়। লালন সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণের প্রশ্নে তাঁর জীবনপরিচয় উদ্‌ঘাটন এখন তাই জরুরি হয়ে উঠেছে, কারণ তাঁর জীবন ঘিরে গড়ে-ওঠা এবং বানিয়ে-তোলা দুরকম কাহিনী অস্বস্তিতে ফেলে আজকের জিজ্ঞাসুদের। একথা অবশ্য সত্য যে একজন অন্তর্মগ্ন সাধক এবং তাঁর ভাবসাধনাজাত উপলব্ধির গান বুঝতে তাঁর জীবন-ঘটনার অনুপুঙ্খ তত আবশ্যিক নয়। কিন্তু মরণোত্তর প্রজন্মের গবেষক ও লেখকরা লালনের মতো স্বভাব-প্রচ্ছন্ন মানুষকে নিজের-নিজের স্বার্থে এমনতর সব মিথ বা অতিকথনের সূত্রে জড়িয়ে দিচ্ছেন, টেনে আনছেন তাঁকে জাতিসংশয়ের পাঁকে যে সত্যলব্ধ নিরপেক্ষ ভাবগ্রাহী রসিকগণ লালনের গানের প্রকৃত মহিমা না বুঝে তাঁর জীবনপরিচয়ের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। তার ফলে শেষ পর্যন্ত লালন আর তাঁর রচনার মর্মগ্রাহীদের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে 'লক্ষ যোজন ফাঁক'।

সেই ফাঁক ভরাবার সাধ্য আজ আমাদের আয়ত্তে নেই, কিন্তু লালনের জীবনবিবরণ যেভাবে আমাদের কাছে ক্রমিকভাবে এসেছে, তা অনুধাবন করলে কিছু মানুষের উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা ধরা পড়বে। একথাও বোঝা যাবে যে, কেমন করে শিক্ষিত মানুষ নিজের অনধিকার সত্ত্বেও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিতে মহৎ ব্যক্তিকেও দেশকালধর্মের বৃন্তে বাঁধতে চান, অথচ মহৎ ব্যক্তিটি থেকে যান অধরা। এবারে শোনা যাক সেই জীবনবিবরণ।

১৮৯০ সালে ৩১ অকটোবর "হিতকরী" পত্রিকায় অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়-প্রতিবেদনে (প্রতিবেদক অজ্ঞাত) সর্বপ্রথম জানা যায়:

> সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহার জাতি। ইহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমনকালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকীর হয়েন। ইহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল।

এই বিবরণ সাদামাটা, কোথাও কল্পনার প্রলেপ পড়ে নি। প্রতিবেদক যদিও জানিয়েছেন জীবিত কালে লালন ফকিরকে 'স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি' কিন্তু লালনের পূর্বাশ্রমের বিবরণ তাঁকে খুব উপকরণহীন আয়োজনে ব্যক্ত করতে হয়েছে এবং জীবনকাহিনীর গোড়াতেই 'নাকি' বলে এক সংশয়বাচক শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। লালন-শিষ্য শীতল ও ভোলাইয়ের উল্লেখ এই প্রতিবেদনের পরের অংশে আছে। কিন্তু শিষ্যগণ যে গুরুর 'নিষেধ-ক্রমে' বা 'অজ্ঞতাবশত' কিছুই বলতে পারেন না এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রতিবেদকের পরিবেশিত বিবরণ অন্তত শিষ্যদের বলা নয়। তাহলে কোথা

লালন ফকিরের মাজার

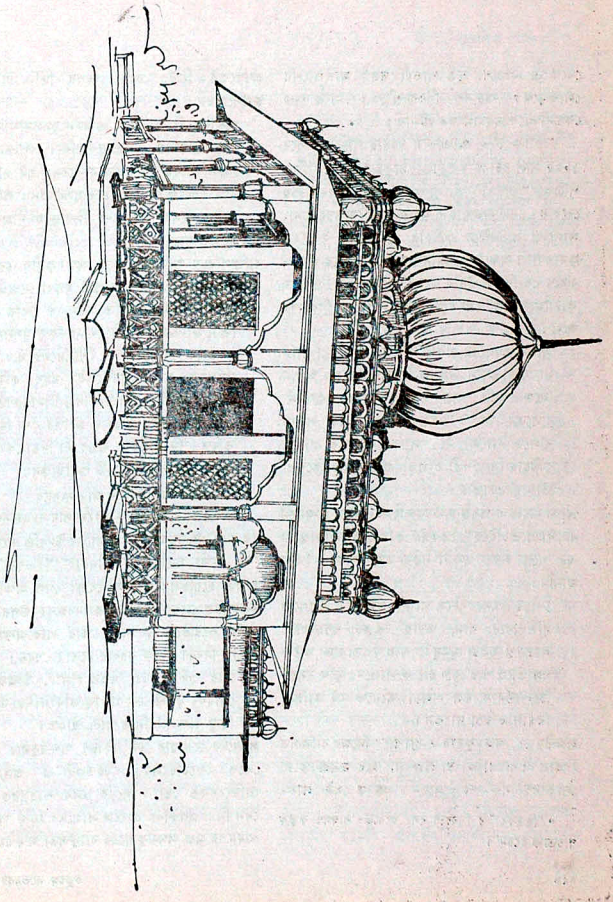

স্কেচ: আমিদ চৌধুরী

থেকে এ বিবরণের সূত্র পাওয়া গেল? আশপাশের লোকমুখে? বাচনিক কিংবদন্তীতে? নাকি অন্য কোনোভাবে অন্তরাগীদের রটনায়?

"হিতকরী"-র প্রতিবেদন রচনার পাঁচ বছর পরে ১৮৯৫ সাল বরাবর কলকাতার ঠাকুরবাড়ির প্রকাশিত পত্রিকা "ভারতী"-তে লালনের এক জীবনপরিচয় বেরোয়। সেটি রাজশাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র রচনা। লালনের সাধনপীঠে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার সন্নিহিত কুমারখালি অঞ্চলে সরেজমিন অনুসন্ধান করে অক্ষয়-কুমার যে-বিবরণ তৈরি করেন তাতে প্রথম বিবরণের কাঠামোয় একটু মেদমাংস লাগানো। সেই বিবরণের অংশ :

> লালন ফকিরের সকল কথা ভাল করিয়া জানি না, যাহা জানি তাহাও কিম্বদন্তীমূলক। লালন নিজে অতি অল্প লোককেই আত্মকাহিনী বলিতেন, তাঁহার শিষ্যেরাও বেশী কিছু সন্ধান বলিতে পারেন না। লালন জাতিতে কায়স্থ, কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়া গ্রামের ভৌমিকেরা তাঁহার স্বজাতীয়।

বোঝা যাচ্ছে এ-পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের বিবরণ, কিম্বদন্তী নয়, দাঁড়াতে চাইছে "হিতকরী"-র বিবরণের ভাষান্তরে। এর পরে অবশ্য একটা নতুন তথ্য আসে। তিনি জানান :

> ১৩১২ বৎসর বয়সে বারুণী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ যান, তথায় উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু দশায় পিতামাতা কর্তৃক গঙ্গাতীরে পরিত্যক্ত হন।* লালনের মুখে বসন্ত-চিহ্ন বর্তমান ছিল বলিয়া অনেকে এই কাহিনী বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

লক্ষণীয় যে, অক্ষয়কুমার এ ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা ধারণা কী তা ব্যক্ত না করে জনশ্রুতি বা লোকবিশ্বাসের কথা তুলেছেন। সম্ভবত সেই লোক-শ্রুতিকেই নির্ভর করে এরপর তিনি অধিকন্তু জানিয়েছেন :

> শ্মশানবাসী লালনকে একজন মুসলমান ফকীর সেবা-শুশ্রূষায় আরোগ্য করিয়া লালনপালন করেন ও ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। এই ফকিরের নাম সিরাজ সা, জাতিতে মুসলমান। লালনের প্রণীত অনেক গানে এই সিরাজ সা দীক্ষাগুরুর উল্লেখ আছে।

ব্যক্তিপরিচয় অতিক্রম করে অক্ষয়কুমার এর পরে লালনের জাতি ও ধর্মমত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> লালনের ধর্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। তিনি জাতিভেদ জানিতেন না, হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন ও শিষ্যদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতেন। লালন হিন্দু নাম, সা উপাধি মুসলমানজাতীয়—সুতরাং অনেকেই তাঁহাকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিত। তিনি কোন উত্তর না দিয়া কেবল স্ব-প্রণীত নিম্নলিখিত গানটি শুনাইতেন :
>
> সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
> লালন ভাবে জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।

এর পরে অক্ষয়কুমার সমগ্র গানের উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই গানটাই "হিতকরী"-তেও মুদ্রিত হয়েছিল। তাহলে বোঝা গেল অক্ষয়কুমার জনশ্রুতির চেয়ে "হিতকরী"র বিবরণের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। অবশ্য তাঁর পরিবেশিত কিছু বাড়তি বিবরণও লক্ষ করবার মতো। যেমন :

> তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্ত ভাব দেখিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যাইত।

লালনের চেহারার এই বিবরণ অক্ষয়কুমার কোথা থেকে পেয়েছিলেন? "হিতকরী"-র প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেদকও তো লালনের এমন শারীরিক বর্ণনা দেন নি। রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে লালনের হিন্দু পরম্পরা প্রমাণের জন্য অক্ষয়কুমারের ব্যাকুলতা লক্ষণীয়।

* "হিতকরী"-র বিবরণে বলা হয়েছে 'সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন'।

এর পরে লালনের গুরুপরিচয় এবং জাতি ও জন্মস্থানঘটিত খবর মেলে সম্পূর্ণ অন্য এক সূত্র থেকে। *The Journal of the Anthropological Society of Bombay*-র ১৯০০ সালের পঞ্চম খণ্ডের ২০৩ থেকে ২১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী এক নিবন্ধে ('On Curious Tenets and Practices of a Certain Class of Faqirs in Bengal' : Maulavi Abdul Wali) লালন সম্পর্কে জানা যায় :

> Another renowned and the most melodious versifier, whose 'dhuyās' are the rage of the lower classess, and sung by boatmen and others, was the far famed "Lālan Shāh" He was a disciple of "Siraj Shāh" and both were born at the village Harispur, Sub-division Jhenedāh, District Jessore.

এই বিবরণ সম্বলিত নিবন্ধ আসলে ১৮৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর এসিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভায় পাঠ করেছিলেন মৌলবী আবদুল ওয়ালী। তিনি ছিলেন এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এবং যশোহরের শৈলকুপায় সাব রেজিস্ট্রার পদে কর্মরত। পঠিত নিবন্ধটি সম্পূর্ণত জার্নালে বেরোয় নি। তাই লেখক নিবন্ধশেষের পাদটীকায় জানিয়েছিলেন :

> I regret that a considerable portion of this paper describing the secret acts of the devotees was found unsuited for this Journal, and consequently not published.

সেকালের ফকিরিতত্ত্ব এবং তাদের দেহসাধনার ক্রিয়াকলাপের বিবরণবহুল আবদুল ওয়ালীর এই নিবন্ধ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু লালন প্রসঙ্গে তাঁর তথ্যনিষ্ঠতা বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। সে কথা পরে উঠবে, আপাতত দেখা যাক ১৮৯৮ সাল বরাবর লালনপ্রসঙ্গের জনশ্রুতি কতটা লতিয়ে কী রূপ ধরেছে। তিনি লিখেছেন :

> Having travelled long and made pilgrimages to Jagannath and other shrines, and met with all sorts of devotees, he at last settled at Mauza Siuriyā, near the sub-divisional headquarter of Kushtiya (Nadiya). Here he lived, feasted, sang, and worshipped and was known as a Kayastha, and where he died some ten years ago. His disciples are many, and his songs are numerous.

এ-বিবরণে দেখা যাচ্ছে তীর্থভ্রমণ ব্যাপারটি মুর্শিদাবাদের বারুণী স্নান থেকে সরে জগন্নাথমন্দিরে চলে গেছে। (অন্য কেউ আবার উল্লেখ করেছেন নবদ্বীপের), তবে বসন্তরোগ ও পরিত্যক্ত লালনের কাহিনী আবদুল ওয়ালীর কানে যায় নি। জনৈক মুসলমান ফকিরের অনুকূলে বেঁচে ওঠা এবং সিরাজ সাঁইয়ের কাছে ফকিরি মতে দীক্ষা ঘটনা দুটিও ওয়ালী বলেন নি। তবে জগন্নাথদর্শন (বিধর্মীর জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ নিষেধ) এবং কায়স্থ বর্ণের উল্লেখ করে নিবন্ধকার লালনের হিন্দু উৎস মেনে নিয়েছেন, যদিও বলেছেন সিরাজ শাহ তাঁর গুরু। অবশ্য ওয়ালীর তথ্য ও মন্তব্য পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা সমগ্র নিবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় তিনি অন্যের কাছ থেকে সবকিছু শুনেছেন। গ্রাম্য গান সম্পর্কেও তাঁর ধারণা যে তেমন শক্তপোক্ত নয়, তা বোঝা যায় লালনের গানকে যখন 'ধুয়ো' গান বলে বসেন। বস্তুত লালনের সমসময়ে পাগলা কানাইয়ের (১৮১০-১৮৮৯) ধুয়োজারি গান যশোহর ও উত্তর-বঙ্গে খুব জনপ্রিয় ছিল।[১] আশ্চর্য যে ওয়ালী নিজে যশোহরের মানুষ হয়েও ধুয়োগানের সঙ্গে লালনের মারফতি গানকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, মানুষটি কিছুটা অসতর্ক এবং সেই কারণে তাঁর রচনার তথ্য খুব নির্ভরযোগ্য নয়। অসতর্কতার আর-একটি নমুনা দেখা যাক। নিবন্ধের গোড়ায় আবদুল ওয়ালী বলেছেন ফকিরদের সাধনা ও

গুহ্যতত্ত্ব বুঝতে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। কিন্তু—

> The Faqirs would in no case meet me, the books and tracks written by them were all composed in their "mystic language", and the refutations of some of them were written by men without any knowledge and insight into their character. Such being the case, I despaired of adding to my scanty knowledge as to their abominable character and habits. The songs of Lālan Shāh, Sirāj Shāh, and other Faqirs, sung by boat-men and others, were very good in their own way, but did not solve the mystery.

ওয়ালীর মন্তব্য থেকে বোঝা যায়—ফকিরদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে নি, তিনি বোঝেন নি তাদের গূঢ় গানের ভাষা, ভালোবাসতেও পারেন নি তাদের। সে নাহয় হল কিন্তু লালনের গানের পাশে সিরাজের গানের উল্লেখ করে তিনি পরবর্তী গবেষকদের বিমূঢ় করে দিয়েছেন। তবে কি তাঁর বিবেচনায় সিরাজ শাহও একজন গীতিকার? অসতর্কতা এতটাই? ওয়ালীর মন্তব্য হয়তো উড়িয়েই দেওয়া যেত কিন্তু পাকিস্তান-পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গের কোনো-কোনো মুসলমান গবেষক তাঁর মন্তব্যের বরাত দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। তার মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত হল, লালনের জন্মভিটা যশোহরের হরিশপুর। কেন? না যেহেতু ১৮৯৮ সালে ওয়ালী বলেছিলেন। তিনি কোথা থেকে সেই তথ্য পান? তাঁর মন্তব্য অনুসারে—

> myself have got...information through men who outwardly profess Muhammadanism.

যাই হোক, আপাতত ওয়ালীর প্রসঙ্গে ক্ষান্তি দিয়ে লালনজীবনের পরবর্তী প্রাপ্ত বিবরণ পেশ করি। সেই বিবরণ ১৯০৯ সালে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের এক ভাষণের শ্রুতিলিখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। মনোমোহন বসুর লিখনে পরিগৃহীত রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্য (কিছুটা লেখকের গুরুচণ্ডালী সমেত) বেশ চমকপ্রদ। ছাত্রদের সভায় তিনি নানাকথার মধ্যে বলেছিলেন :[২]

> আর একটি বিষয়—যেটা আমার বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়। সেটা ছোট ছোট নূতন ধর্মপ্রচারকদের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ করা। মফস্বলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে হয়ত পল্লীর নিভৃত ছায়ায় কোনো ব্যক্তি এক নূতন ধর্মসম্প্রদায় সংগঠন করিতেছেন। তাঁহারা ভদ্রসমাজে বিশেষ পরিজ্ঞাত নহেন, কিন্তু সমাজের মধ্যে তাঁহারা কি বলিতে এসেছেন, কি বলছেন এটা জানা উচিত, এইগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমত প্রচলিত হইতেছে, অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে যে সকল শক্তি সমাজের মধ্যে কাজ করিতেছে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। আমি এইরূপ একজন ধর্মপ্রচারকের বিষয় কিছু জানি—তাঁহার নাম লালন ফকির। লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—এরূপ শুনা যায় যে তাঁহার বাপ-মা তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে তাঁহার বসন্ত রোগ হওয়াতে তাঁহাকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যান। সেইসময় একজন মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান জৈন মত-সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় হইয়াছে। এ বিষয়ে সকলেরই মন দেওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের এই মৌখিক ভাষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনিও স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে শুনেছেন যে লালনের জন্ম হিন্দু পরিবারে, বসন্ত-রোগগ্রস্ত হওয়ায় বাপ-মা কর্তৃক ত্যক্ত, মুসলমান ফকিরের আনুকূল্যে লালিত ও দীক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ কেবল একটি নতুন মন্তব্য করেছেন লালনের ধর্মমত বিষয়ে। তাঁর ধারণা—লালনের ধর্মমত নিভৃত পল্লীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমতের মধ্যে অন্যতম এক গৌণধর্ম (Minor Sect), যাতে মিশেছে মুসলমান ও জৈনধর্মের স্রোত। তিনি লালনের গানের স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন নি কিন্তু তাঁকে একজন ধর্মপ্রচারক বলেছেন। বিশেষত লক্ষণীয় যে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ 'বাউল' বলেন নি।

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ১৯০৯ সালের এই বিবরণের পর দীর্ঘকাল লালনজীবনের কাহিনী বা মিথ নতুন কল্পনা ও তথ্যের পত্রপল্লবে মহীরুহের আকার নেয় নি। তার কারণ, এর পরবর্তী কাল সমগ্র দেশের পক্ষে এক উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পরিবেশ। ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গবন্ধ আন্দোলন ঘিরে শুরু হয়েছিল যে জনবিক্ষোভ ও অস্থিতি, তারই বিপুল বিস্তার ঘটল স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপকতর জনউন্মাদনায়। ইত্যবসরে ঘনিয়ে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলে উদ্ভূত সংকট, অর্থনৈতিক মন্দা এবং মানুষের অস্থিরতা। সেই বাস্তব উন্মুখর উদ্দামতার মধ্যে সুদূর কুষ্টিয়ার প্রত্যন্তে ছেঁউড়িয়া আশ্রমে কেইবা সন্ধান করেছেন লালনের উত্তরসাধক বা তাঁদের ধর্মসাধনার স্বরূপকে?

তথ্য ঘাঁটলে ভিন্নতর খবরও পাওয়া যায় অবশ্য। যেমন লালনের আখড়ার ওয়ারিশন নিয়ে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ততদিনে প্রচণ্ড গোলমাল বেধেছিল। রবীন্দ্রনাথসমীপে লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন ফকিরের প্রেরিত চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে অন্য দুই লালনশিষ্য ভোলাই ও শীতল শাহর সঙ্গে তার বিবাদ চলছে। লালনের এইসব শিষ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ ভালো আলাপপরিচয় ছিল। যার একটা স্পষ্ট উল্লেখ পাই শান্তিদেব ঘোষের "রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা" বইয়ের মধ্যে। ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের গ্রামসেবা প্রসঙ্গে শান্তিদেবের পিতা কালীমোহন ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শা ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত।'[৩]

এইসব আলাপপরিচয়ের ও ভাববিনিময়ের পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ "প্রবাসী" পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে লালনের ২০টি গান ছাপেন এবং তার ফলে বাঙলার বিদ্বজ্জনসমাজে লালনের গান ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে লালনগীতির যে-খাতা আছে তার থেকে নকল করে রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলি "প্রবাসী"-তে দেন নি তার প্রমাণ, প্রকাশিত ২০টি গানের মধ্যে ১২টি ওই খাতায় নেই। তাহলে গানগুলি কোথা থেকে পেয়েছিলেন তিনি? সম্প্রতি জানা গেল, ভোলাই শাহের একখানা খাতা সত্যিই রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল। এতদিনের গড়-ঠিকানিয়া সেই খাতা সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা। তাঁর সংগৃহীত খাতা থেকে দেখা যায় "প্রবাসী"-তে প্রকাশিত ২০টি গান তাতে আছে। খুব রোমাঞ্চকর সংবাদ।

সে যাই হোক, ১৯১৫ সালের পর সাধারণভাবে লালন বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজনে বেশ ভাঁটা পড়ে। রবীন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়েন নানা কর্মবৃত্তে, নোবেল প্রাইজ তাঁকে জগৎকবিসভায় উত্তরণ করায়। তিরিশের দশকে খোদ কুষ্টিয়ায় থেকেও অন্নদাশঙ্করের মতো মরমি মানুষ ছেঁউড়িয়া আখড়া যান নি। তিনি নিজেই কবুল করেছেন; 'আমি কুষ্টিয়া ছেড়েছি ১৯৩৬ সালে। পূর্ববঙ্গ থেকে বিদায় নিয়েছি ১৯৪৭ সালে।...লালনের নাম আমি কুষ্টিয়ায় থাকতেই শুনেছিলুম। কিন্তু কোনোদিন তাঁর আখড়ায় যাওয়া হয়ে ওঠে নি। যদিও মাইল দেড়েকের ব্যবধান।' কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর কিন্তু লালনবিষয়ে উৎসাহ নেন নি, এর থেকে লালনপন্থীদের ওই সময়ের নিঃসঙ্গতা ও লোকায়ত নিম্নবর্গের হতদশার পরিচয় মেলে। অথচ ওই সময়েই কুষ্টিয়ার মুন্সেফ মতিলাল দাশ স্বারোপিত দায়িত্বে

লালনগীতি সংগ্রহ করেছেন কুষ্টিয়া থেকে। তাঁর সংগৃহীত ও সংকলিত ৩৭১ খানি লালনের গান "লালনগীতি" (১৯৫৮) নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনভুক্ত গানের পাঠ যদিও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় (কেননা গানের বাণী অত্যন্ত শিষ্ট) তবু এই গানগুলির পাঠই এ-পর্যন্ত বেশির ভাগ গবেষক ব্যবহার করে আসছেন।

রবীন্দ্রনাথ থেকে মতিলাল দাশের প্রয়াসের মাঝখানে লালনচর্চা খুব ব্যাপক অভিনিবেশ বা মর্যাদা পেয়েছে একথা বলা যাবে না। কেবল পূর্ব-বঙ্গের দুই ব্যক্তি বসন্তকুমার পাল ও মুহম্মদ মনসুর-উদ্দিন লালন সম্পর্কে কৌতূহল ও সক্রিয়তা বরাবর বজায় রেখেছিলেন। মনসুরউদ্দিনের প্রয়াস ছিল প্রধানত তাঁর "হারামণি" নামের লোকসাহিত্য সংগ্রহের নানা খণ্ডে লালনগীতি প্রকাশ করা। বিভিন্ন সূত্রে মৌখিক ধারায় তিনিই এখনও পর্যন্ত দুইবঙ্গে লালনগীতির সবচেয়ে বড়ো সংগ্রাহক। বসন্তকুমারের কাজ কিন্তু অনেক ব্যাপক। তাঁর কৌতূহল ছিল সার্বিকভাবে লালনজীবন ও লালনের রচনা সম্পর্কে। এ ব্যাপারে তিনি ১৯২৫ সালে "প্রবাসী" পত্রে (শ্রাবণ ১৩৩২) "ফকির লালন শাহ" নামে একটি নিবন্ধ লেখেন এবং পরে ১৯২৮ সালে ওই পত্রিকাতেই লেখেন আরেকটি নিবন্ধ "লালন শাহ" (বৈশাখ ১৩৩৫)। এই দুই নিবন্ধে অস্ফুট অথচ তাঁর স্পষ্ট ধারণাগুলি তিনি শেষ পর্যন্ত রূপায়িত করেন ১৯৫৫ সালে একটি বইয়ের সাহায্যে। বইটির নাম "মহাত্মা লালন ফকির"।

লালন সম্পর্কে বসন্তকুমারের প্রদত্ত বিবরণ ও মতামত খুব গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে পরবর্তী কালের লালন-গবেষকদের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যক ব্যক্তি তাঁর পরিবেশিত তথ্য মেনে নিয়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে এ কথাও উল্লেখযোগ্য, বসন্তকুমারই সর্বপ্রথম লালন সম্পর্কে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর ধূসর খণ্ড-গুলির মধ্যে একটা ঘটনাবিন্যাসের স্পষ্টতা এনে তাঁর জীবনবিবরণের সম্পূর্ণতাসাধন করেন। কিন্তু এই কাজে তাঁর অধিকার বা যোগ্যতা ছিল কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বসন্তকুমারের সমগ্র জীবনটাই কেটেছে লালন ফকিরের সার্বিক সন্ধানের কাজে। কাজেই এই অনুসন্ধানের জন্য অনুরাগ ও একনিষ্ঠতাই তাঁর প্রধান যোগ্যতা। অধিকারের প্রশ্নে বলা যায়, লালনের জন্মভিটা বলে কথিত ভাঁড়ারার পাশের গ্রাম ধর্মপাড়ায় তাঁর ভিটা। সেই সূত্রেই তাঁর কৌতূহল পরিপূরণ তথা ক্ষেত্রানুসন্ধান অনেক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। তিনি জানিয়েছেন, 'শৈশবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী শুনিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করি।'

এর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য মনসুরউদ্দিনের ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের ব্যাপ্ত সময়ে গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ে সংগৃহীত বহুশত লালনগীতির প্রসঙ্গ যা প্রকাশিত হয়েছে ৭ খণ্ড "হারামণি" সংকলনে। বসন্তকুমার যেভাবে লালনজীবনের বিবরণ দেন, তাতে সমর্থন দিয়েছেন মনসুরউদ্দিন। আপাতত আমরা বহুজনগ্রাহ্য এবং বেশিরভাগ গবেষকের অনুমোদিত সেই লালনজীবনী সংক্ষেপে বলছি।

লালন ফকির অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অন্তর্গত কুমারখালিসংলগ্ন গড়াই নদীর তীরে ভাঁড়ারা (চাপড়া-ভাঁড়ারা) গ্রামে জন্মান। তাঁর জন্ম কায়স্থ পরিবারে, পদবী কর (মতান্তরে রায়)। বাবা-মার নাম মাধব ও পদ্মাবতী। বাবা-মা-র একমাত্র সন্তান লালন শৈশবে বাবাকে হারান এবং সেই কারণে বিধিবদ্ধ বৈদ্যালয়িক শিক্ষা পান নি। তাঁর মাতুলবংশ ছিল চাপড়ার ভৌমিকরা। দুই গ্রামেই ছিল লোকঐতিহ্যের সগর্ব পরম্পরা এবং গানের ধারা। ছোটবেলা থেকে লালন ভালবাসতেন গানবাজনার পরিমণ্ডল বিশেষত কীর্তন ও কবিগান। ধর্মভাবও ছিল স্বভাবগত। অল্প বয়সে পিতৃহীনতার ফলে লালন

অকালেই সংসারে জড়িয়ে পড়েন এবং বিবাহিত হন। কিন্তু আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে বিরোধ বিতর্কে বিরক্ত হয়ে স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে নিজের গ্রামেই দাসপাড়া অঞ্চলে আলাদা বাসস্থান বানান।

পরবর্তী কোনো সময়ে দাসপাড়ার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তিনি বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান এবং বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন বসন্তরোগে। আচ্ছন্ন ও অচৈতন্য লালনকে ফেলে সঙ্গীদল সম্ভবত রোগের ভয়ে পালিয়ে আসেন গ্রামে এবং লালনের মৃত্যুর খবর রটিয়ে দেন। তাঁরা হয়ত লালনকে মৃত মনে করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

লালন- জীবনের স্রোত এবারে চলে আসে নতুন এক নির্মাণে। পরবর্তী ঘটনা:

মৃতকল্প সংজ্ঞাহীন লালনের দেহ নদীর কূলে ভাসমান দেখতে পেয়ে একজন স্নেহশীলা মুসলমান নারী উদ্যম করে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা করে বাঁচিয়ে তোলেন। কেবল বসন্তরোগ রেখে যায় তার দাগ। কিন্তু আরও বড় হৃদয়ক্ষত লালনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুস্থ হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে সমাজের শাস্ত্র-কঠোর নির্দেশে পরিবারে লালন স্থান পেলেন না। কেননা বাড়ীতে তাঁর শ্রাদ্ধকার্য হয়েছে এবং তিনি মুসলমানের অন্ন খেয়েছেন। ব্যথিত সন্তপ্ত লালন জাতি ধর্ম সম্পর্কে আস্থা হারালেন। ক্রমে সিরাজ শাহ নামে এক তত্ত্বজ্ঞের কাছে লোকায়ত মতে দীক্ষা নিয়ে সবরকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্পর্কে অনুৎসাহী হয়ে পড়েন। পরে সিরাজের নির্দেশে কুষ্টিয়ার সন্নিহিত ছেঁউরিয়া গ্রামে ১৮৮৩ সাল নাগাদ আখড়া বানান। আশপাশের কারিকর সম্প্রদায় তাঁকে বরাবর পোষকতা করেছেন। নিভৃত সাধনা ও ঐশী অনুভবের নির্জনতায় লালন একরকমের সিদ্ধতা অর্জন করেন, যার রূপায়ন হ'তে থাকে অন্তরস্বভাবী বহুতর নিগূঢ় মর্মের গানে। হিন্দু মুসলমান দুই তরফ থেকেই শিষ্যসেবক জুটতে থাকে। লালনও পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নানা অংশে ভ্রমণশীল হন। বাউল বা মারফতি সাধকরূপে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ঘটে। অবশেষে ১৮৯০ সালে তাঁর তিরোধান ঘটে।

কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি থেকে গড়ে-ওঠা লালনজীবনের বিবরণ যে সর্বাংশে আমাদের মেনে নিতে হবে এমন কোনো দায় নেই। বস্তুত, লালনকে বা তাঁর গানের মর্ম বুঝতে তাঁর জীবনকাহিনী যে খুব জরুরি তাও নয়। লক্ষ করলে বরং বোঝা যায়, লালনের নিজের অভিপ্রায় অন্য রকমের ছিল। তিনি জাতাজাতির ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ মানবধর্মে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে গেছেন।

কিন্তু মানুষের কৌতূহল এবং লোককাহিনীর বিচিত্র নির্মাণের পথ নিজেই নিজের লক্ষ্য তৈরি করে। তাই লালনের গঙ্গাস্নানের অভিযান মুখে-মুখে পালটে যায় কখনও নবদ্বীপের অভিমুখে, কখনও বা শ্রীক্ষেত্রে এবং এমনকী রাজশাহীর খেতুরির দিকে। জনশ্রুতি অনুযায়ী কোনো বিবরণে বসন্তরোগাক্রান্ত লালন পরিত্যক্ত হন সঙ্গীসাথীদের দ্বারা, কখনও এমনকী নিজের বাবা মা-র দ্বারা। অভিযানের বয়স নিয়েও নানা কাহিনীর নানা বয়ান। মুমূর্ষু লালনের উদ্ধার-কর্তা কারো মতে একজন মুসলমান নারী, কারো মতে মুসলমান ফকির। এত সব কাহিনীগত মতান্তর সত্ত্বেও একথা খুব স্পষ্ট যে, লালন- জীবনের বিবরণে একটা সচেষ্ট ও সতর্ক আবরণ আছে। সেই আবরণ সংগ্রাহকদের স্বনির্মাণ নয়, অনেকটাই যেন উৎস থেকে উৎসারিত বিভ্রান্তি। লোকধর্ম নিয়ে যাঁদের সরেজমিন জানাশোনা আছে তাঁরা জানেন কিছু-কিছু গৌণধর্মের ঐশীমহিমাখ্যাপনে একটা রহস্যের পরিমণ্ডল, কিছু আশ্চর্য নিষ্ক্রমণ বা অন্তর্ধান কিংবা আকস্মিক আবির্ভাবের ঘটনা থাকেই।

এমন ছয়েকটা উদাহরণ এখানে দেখা যেতে পারে। ঘোষপাড়ার 'কর্তাভজা' সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে আউলচাঁদ নামে এক ফকির হঠাৎ ঘোষপাড়ায় আসেন এবং তাঁর থেকেই এই মতবাদের উদ্ভব। কোথা থেকে যে তিনি এসেছিলেন তা কেউ জানে না তবে তিনি ছিলেন কন্থাধারী মুসলমান, যদিও বৈষ্ণব। তাঁর আসল নাম অজ্ঞাত। আউলচাঁদ নাম ভাঁড়িয়ে তিনি বৈষ্ণবীয় গৌণধর্মের পরম্পরায় ঢুকে গেছেন। 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের নাম কী ছিল? গানে বলা হয়েছে ব্রজধামের কর্তা রাইধনীই বর্তমানে সাহেবধনী। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে তাঁর মোকাম। এখানেও ইসলামি উৎসে বৈষ্ণবীয় প্রলেপ। মেহের-পুরের 'বলাহাড়ি' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরাম প্রথমে স্বগ্রামেই ছিলেন। পরে একটা ঘটনায় গ্রামত্যাগ করে বেশ ক বছর পরে ফিরে আসেন জটাজূট সন্ন্যাসী হয়ে এক নবধর্মের উৎস হয়ে। পাথর-চাপাড়ির ফকির নাম ভাঁড়িয়ে অন্যত্র খ্যাত হয়ে ওঠেন জগাইচাঁদ নামে।[৪]

এত সব উদাহরণ দিয়ে আমি একটা কথাই বোঝাতে চাইছি, তা হল, লৌকিক গৌণধর্মের বিশ্বাসের জগৎ কল্পকুহেলিকায় খুবই রহস্যময়। সেখানে আবির্ভাব, অন্তর্ধান, ধর্মসমন্বয়, নামভাঁড়ানো, স্থান বদলানো বহুবার ঘটেছে। সেই কথা মনে রেখে লালনকাহিনী পড়লে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। তাঁর জ্যান্তে মরার বিবরণটাও স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। লালন নামটাও ভাঁড়ানো তো নয়?

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে, লালন ফকিরের উৎস-সন্ধানে গবেষকদের কৌতুককর নানা প্রয়াসের কাহিনী। এটা সত্যি যে ১৮৯০ সালে লালনের মৃত্যুর পক্ষকালে "হিতকরী" ঘোষণা করেছিল তাঁর জীবনী-রচনার কোনো উপকরণ নেই, কোনো আত্মীয়ও জীবিত নেই। তবু কেউ-কেউ প্রয়াস পেয়েছেন এ ব্যাপারে, তবে অনেক পরে। যেমন আনোয়ারুল করীম। তিনি কুষ্টিয়া কালেক্টরেটের রেকর্ড রুম ঢুঁড়ে ১৯২২ সালের পুরানো খতিয়ান থেকে তৈলব্যবসায়ী লালন কলুকে লালন ফকির বলে প্রতিপন্ন করেন প্রবন্ধ লিখে। করীমের মতে লালনের পিতার নাম আনন্দ সা, সাকিন ভাঁড়ারা। এ সম্পর্কে আবুল আহসান চৌধুরী প্রতিবাদ-প্রবন্ধ লেখেন। আহসান লেখেন:[৫]

> লালন কলু বাউল সাধক লালন অপেক্ষা প্রায় ৫০ বছরের ছোট ছিলেন। সাধক লালন দেহত্যাগ করেন ১৮৯০ সালে। আর কলু লালন ১৯৩০ সালেও জীবিত ছিলেন। সাধক লালনকে ছেঁউড়িয়ায় সমাধিস্থ করা হয়। পক্ষান্তরে লালন কলুর কবর ভাঁড়ারায় অবস্থিত। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার লালন কলুর স্ত্রী এখনো [১৯৭৪] জীবিত—তার বয়স অনূর্ধ্ব ৬০। সাধক লালনের মৃত্যু হয়েছে আজ ৮৩ বছর। অর্থাৎ আনোয়ারুল করীমের তথ্যানুযায়ী লালনের মৃত্যুর ২৩ বছর পরে তার স্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত লালনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

গবেষণার এই কৌতুককর প্রণালী সত্যিই চমকপ্রদ। কিন্তু এমন ধরনের উদাহরণ থেকে বুঝতে পারা যায় লালনজীবন সম্পর্কে মিথ রচনা কতখানি উর্বর মস্তিষ্কে চলছে।

বিশেষত পাকিস্তান কায়েম হবার পর হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তানের কিছু গবেষক লক্ষ করলেন লালনকে হিন্দু উৎসে স্থাপন করা হয়ে এসেছে বরাবর। সুতরাং তাঁর মুসলমান-পরম্পরা প্রমাণ করা জরুরি। সেই প্রয়াসে এতদিনকার প্রচলিত লালনবিবরণের পুন-র্বিন্যাসের প্রয়োজন অগ্রাধিকার পেল। এখানে আমার বলার কথা এই নয় যে, লালনের হিন্দুত্ব সঠিক তথ্য-ভিত্তিক বা আমি তার সমর্থক, বরং বলতে চাই তাঁর মুসলমানিত্ব প্রমাণের তড়িঘড়ি কোনো দরকার ছিল না। কেননা তাতে লালনকে বোঝা একচুলও এগোয় না। কিন্তু মিথ, যার একটা অর্থ অতিকথন, তা এগিয়েই চলে। এবারকার রচয়িতা অধ্যাপক আবু তালিব। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর "লালন পরিচিতি" বইটি শুরু হয়েছে নাটকীয় বর্ণনায়, যার শিরোনাম 'নদীর তীরে অচিন মানুষ কে গো?'—

> বাংলা ১২২২ সালের একটি সকাল।
>
> নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমা শহরের অদূরে কালীগঙ্গা নদীর তীর। লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি?
>
> এক বিদেশী যুবকের মৃতপ্রায় দেহ পড়ে রয়েছে। যুবকের সারা দেহে গলিত বসন্ত রোগের চিহ্ন। বেঁচে আছে কিনা, কে জানে?
>
> মলম নামে একটি অসীম সাহসী যুবকের মনে কৌতূহল, হয়ত বেঁচেই আছে। দেখা যাক না, ব্যাপারটা কি?
>
> মলম সাহস ভরে এগিয়ে যায়। সকলেই ছিঃ ছিঃ করতে থাকে। একে বিদেশী আগন্তুক তারপরে আবার মারাত্মক গুটিরোগে আক্রান্ত। মলম কিন্তু বেপরোয়া। সে কাছে যায়। এই যে, লোকটি নড়ে উঠেছে। মলমের মুখে হাসি। 'আঃ একটু পানি!' অস্ফুট কণ্ঠস্বরে মলম চমকে উঠে। তার সারাদেহে বিস্ময়ের জাগরণ আসে। 'লোকটি তাহলে মরেনি!' ভিড়ের মধ্যে কেউ বলে।
>
> 'আর না মরলেও মরার বেশী বাকীও নেই' সঙ্গী তার কথার জের টেনে বলে।
>
> মলম কিন্তু মরিয়া হয়ে ওঠে—'একে আমার বাঁচানো চাই-ই' তার কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ।
>
> 'ওঃ তোমার মনের মানুষ বুঝি?' ঠাট্টা ক'রে পার্শ্ববর্তী বন্ধু বলে উঠে।
>
> অদূরে বাউল ফকীরের কণ্ঠে শোনা যায়—
>
> থাঁচার ভিতর অচিন পাখী
> কমনে আসে যায়
>
> গান শেষ হয়। ইতিমধ্যেই মৃতপ্রায় ব্যক্তি উঠে বসেছে।
>
> 'কে, কে গান গাইলো? আঃ আমার মনের মানুষের গান। কই, এমন করে দরদ দিয়ে আমার মনের মানুষের গান আর তো কখনো শুনিনি! আহা আমার একতারা? আমার একতারাটা কোথায় গেল? (গান) 'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে/সে কি আর জপে মালা।'
>
> গান শেষ হয়। বিস্মিত জনতা সমস্বরে প্রশ্ন করে—'আপনি কি সেই বিখ্যাত কবি লালন শাহ?'
>
> 'না। আমি শুধুই লালন, লালন ফকীর' জবাব আসে। অচিন মানুষ জেগে উঠেছে।[৬]

লালনকে নিয়ে এমন অধ্যাপকীয় মিথের অভ্যন্তরে অনেক কৌশলী টান আছে। নাটক বাদেও অনেক সূক্ষ্ম সৃজনের কারুকাজ এই বর্ণনায় লুকিয়ে আছে। যেমন মৃতপ্রায় চরিত্রটির মুখে 'আঃ একটু পানি' সংলাপ বসিয়ে আবু তালিব বুঝিয়ে দেন লালন জন্মত মুসলমান। "লালন পরিচিতি" বইতে লেখকের সিদ্ধান্ত হল লালনের জন্ম ১১৭৯ বঙ্গাব্দ। সুতরাং ১২২২ সালে কালীগঙ্গা নদীর তীরে মুমূর্ষু লালনের বয়স ৪৩। এই এক চালে লালনের এতদিনকার পুরানো মিথটি ভেঙে পড়ে। ভেঙে যায় পূর্বাশ্রমের লালনের পরিচয়, তাঁকে মুসলমান রমণীর উদ্ধার ও আশ্রয়দানের ঘটনা, তাঁর সংসার ও হিন্দুধর্মবিরাগী-অভিমান এবং সিরাজ সাঁইয়ের মারফতি মতের দীক্ষার ক্রমান্বিত বিষয়গুলি। আবু তালিবের বর্ণনা মেনে নিলে একথাও মানতে হবে যে, ৪৩ বছরেই লালন তাঁর বিখ্যাত গানগুলি লিখে ফেলেছেন এবং সেসব গান এতদূর লোকপ্রচলিত যে পথের বাউল সে গান গেয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। একেই বলে মিথ, যার অন্য নাম অতিকথন। বোঝা দরকার এই নতুন একটা মিথ নতুন উদ্দেশ্যেই বানানো। কিন্তু যে প্রসঙ্গ আর কিছুটা পরে আসবে।

আসলে মিথ সবসময়ে যুক্তিধর্মিতার পথে চলে না, তার খানিকটা স্বৈরস্বভাব থাকে। যেমন ধরা যাক

শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ" বইতে লিখেছেন লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের কাহিনী—

> পল্লীকবি লালন সাঁইজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ পরিচয় জমে উঠল।··· অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সাঁইজী একতারা বাজিয়ে গাইলেন :
>
> আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
> আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর
> তাতে এক পড়শী বসত করে।
>
> রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে গেলেন এই অখ্যাত অজ্ঞাত অশিক্ষিত পল্লীকবির মরমি গান শুনে। আরও গান চলল, সুরের পর সুর, ভাবের পর ভাব, অমৃতের ঢেউ বয়ে গেল সেদিন দুই কবির নিবিড় পরিচয়ের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ও লালনের সাক্ষাৎকার বিষয়ে এইভাবে তৈরি হয় এক মিথ। সত্যিই দেখা হয়েছিল নাকি দুজনে? সত্যমিথ্যানির্ণয় কঠিন। তবে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী দুজনের অমন সাক্ষাৎকার ও ভাববিনিময়ের রসালো বর্ণনা লিখে একটা অদ্ভুত ফুটনোট দিয়েছেন—

> এই কাহিনীটির নায়ক রবীন্দ্রনাথ না হতেও পারেন। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই হয়ত সাঁইজীর এভাবে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল।

প্রশ্ন ওঠে স্বভাবত, তাই যদি হয়ে থাকে তবে ঘটা ক'রে অমন বর্ণনার বিস্তার কেন? উত্তরে বলা যায়, এটা বাঙালির মজ্জাগত স্বভাব: হালকা জিনিস নিয়ে বা অসত্য নিয়ে আবেগ দেখানো। লালন সম্পর্কে এমন অতিরেক বহুক্ষেত্রে ঘটেছে। বসন্তকুমারের বইয়ে এমন একটা নমুনা আছে। "মহাত্মা লালন ফকির" বইটি বসন্তকুমার পাল রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করেছিলেন ১৯৫৫ সালে। তিনি শান্তিপুরের পুরাণ পরিষদের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক অজিতকুমার স্মৃতিরত্নকে বইটির প্রকাশক হতে অনুরোধ করেন। অজিতকুমার তাতে সম্মত হন এবং একটি ভূমিকা লেখেন। কোথায় কুষ্টিয়া আর কোথায় শান্তিপুর, সংস্কৃতের পণ্ডিত অজিতকুমার লালন বিষয়ে কিছু জানেনও না, অথচ ভূমিকায় লিখলেন :

> শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার [লালনের] ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা-মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গমতীর্থ রচনা করে।

রবীন্দ্রনাথ ও লালনের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল কিনা সে তথ্য আজও জানা যায় নি। লালনগবেষক ও রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে এখনও সংশয়ী, অথচ বসন্তকুমারের বইতে (এ বই অনেকের বিচারে খুব নির্ভরযোগ্য) ভূমিকালেখক নিঃসংশয় বর্ণনা যুক্ত করলেন। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের গবেষক আবু তালিব তাঁর বই "লালন পরিচিতি"-তে এই উক্তি বা বর্ণনা ব্যবহার (পৃষ্ঠা ৭৮) করেছেন। এই ভাবেই তো কল্পকাহিনী আর জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে। আমার অবশ্য প্রথম থেকেই খটকা ছিল এ সম্পর্কে, তাই অজিতকুমারকে বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে বলে একটি চিঠি দিই। পত্রোত্তরে অজিতকুমার অসহায়ভাবে আমাকে শান্তিপুর থেকে লেখেন ১৫ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে—

> মাননীয় মহাশয়,
>
> আপনার পত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয় তখন শান্তিপুরে থাকিতেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং তাঁহার লিখিত উক্ত পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখান। আমি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হই, এবং উহার প্রকাশক হইতে আমাকে অনুরোধ করায় আমি প্রকাশকের নিবেদন লিখিয়া দিই। লালন ফকির সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি শুনিয়া ও তাঁহার নিকটেই

বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মিলনের কথা শুনিয়াই আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। সেই বিশ্বাসেই আমি ঐরূপ লিখিয়াছিলাম বোধহয়। বর্তমানে আমার বয়স ৭৭/৭৮ বৎসর, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ, শরীর অসুস্থ, ঐ পুস্তকও এখন আমার নিকট নাই। এ অবস্থায় "জনশ্রুতি" মাত্রই আমার ধরণা [ধারণা]। এই কথা বলা ছাড়া বর্তমানে আপনাকে অন্য প্রমাণ দেখাইতে পারিতেছি না। বসন্তবাবুর ঠিকানাও বর্তমানে আমি জানি না। আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছেন লিখিয়াছেন। বোধহয় আপনি তাঁহার সহিত এ বিষয় আলাপ করিলে সফলতা লাভ করিবেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

নিঃ
শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন

চিঠির শেষাংশ থেকে জানা যাচ্ছে, বসন্তকুমারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সাঙ্গ করে তারপরে আমি অজিতকুমারকে চিঠি লিখি। বসন্তকুমার তখন থাকতেন রানাঘাটের নাস্‌রা কলোনিতে। তাঁর পরামর্শেই আমি অজিতকুমারকে চিঠি লিখি। পরিণামে, এভাবেই ধসে পড়ে বহুলালিত এক জনশ্রুতির কাঠামো।

এসব অনুধাবন করলে মনে হয়, লালন সম্পর্কে সচেতন ভাবনা ও সতর্কতার চাইতে হঠোক্তি বা অতিকথনের ঝোঁক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল। কারুর কারুর লালন সম্পর্কে রচনার অধিকার আছে কিনা সে প্রশ্নও ওঠে। অন্নদাশঙ্কর রায় "লালন ও তাঁর গান" নামে একটি বই লিখেছেন। ১৩৮৫ এবং ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে সে বই দুটি সংস্করণ লাভ করেছে। এ বইতে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন যে কুষ্টিয়ায় মহকুমাশাসক থাকাকালে কখনও লালনের আখড়ায় যান নি। এমনকী পরে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনবার সেদেশে গেছি, কিন্তু কুষ্টিয়া যেতে পারি নি। তাই লালনপন্থী বাউলদের সঙ্গলাভ করিনি' এ কথা কবুল করেও একথানা আস্ত বই লিখে ফেলেছেন তিনি। বইটির মধ্যে যতগুলি তথ্য নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেছেন বা ব্যবহার ও উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দেখা যায়, তার কোনোটি তাঁর মৌলিক নয়, সবই আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত "লালন স্মারক-গ্রন্থ" (১৯৭৪) এবং আনোয়ারুল করীমের লেখা "ফকির লালন শাহ" (১৯৭৬) বই থেকে নেওয়া এবং তার স্বীকৃতিও আছে। তবে মৌলিক মন্তব্য যে একেবারে নেই তা বলা যাবে না। যেমন ix পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'লালনের গানের সংখ্যা হাজার হাজার'। এমন আশ্চর্য এক তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন? আবার অন্যত্র ৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাকি তাঁর চিত্র-পুস্তকে লালনের একখানি প্রতিকৃতি এঁকে নেন।···সেই প্রতিকৃতির সন্ধান এখনো মেলে নি। তবে সেটি ছিল অসম্পূর্ণ। বোধহয় স্কেচ।

এসব 'নাকি', 'বোধহয়' জাতীয় আলগা শব্দ জুড়ে দুই সংস্করণ ধ'রে তাঁর বইতে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া দেখে মনে সন্দেহ হয় তাঁর লালন অনুরাগ সম্পর্কেই। অন্নদাশঙ্কর কি এদেশের লালনচর্চা সম্পর্কে কোনো খোঁজই রাখেন না? রাখলে জানতে পারতেন সুশীল রায়ের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংক্রান্ত গবেষণাগ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ- অঙ্কিত চিত্রসূচীর মধ্যে লালন ফকিরের ছবিটির উল্লেখ আগেই ছিল। অন্নদাশঙ্করের লালনসংক্রান্ত বই বেরোবার দু বছর আগে ১৯৭৬ সালের ২৫ জুলাই (৯ শ্রাবণ ১৩৮৩) আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে 'লালন ফকিরের প্রতিকৃতি' নিবন্ধের সঙ্গে তুষার চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা লালনের স্কেচটি সন্নিবেশ করেন। অন্নদাশঙ্কর এসব খবর না জেনে বা না রেখে কেমন ভারিক্কি চালে লিখে দিয়েছেন 'সেই প্রতিকৃতির সন্ধান এখনো মেলে নি।' অবশ্য এখানে সবিনয়ে উল্লেখ করা চলে যে

অন্নদাশঙ্করের বই বেরোবার এক বছর আগে শারদ সংখ্যা "শিলাদিত্য" (১৩৮৫) পত্রিকায় "বিতর্কিত লালন ফকির" নিবন্ধে আমিও ওই স্কেচটির ফটোকপি ব্যবহার করি। সেই ফটোকপি আমি সংগ্রহ করি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রশালার অছি রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির কাছ থেকে।

এখানে, ওই স্কেচের সূত্রে আরেক গবেষক সনৎকুমার মিত্রের কথা আসে। তিনি তাঁর "লালন ফকির : কবি ও কাব্য" (১৩৮৬) বইতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র একটি উক্তি তুলেছেন। অক্ষয়কুমার ১৩০২ বঙ্গাব্দের "ভারতী" পত্রিকায় সরলাদেবীর প্রবন্ধের শেষে লালন-পরিচিতি প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা লালনের স্কেচটি উল্লেখ করে লেখেন :

> শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র-পুস্তকে ইঁহার একটি প্রতিকৃতি দেখিয়াছি তাহাই লালনের পার্থিব দেহের একমাত্র ছায়া—অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাই একমাত্র আদর্শ।

এই স্কেচ অক্ষয়কুমার ছাড়া আর কেউ দেখেন নি এমন নয়, কিন্তু সনৎকুমার মিত্র তাঁর বইয়ের ৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় খুব জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন :

> কেউ-ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা স্কেচটি দেখেন নি একমাত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ছাড়া। এবং তারপর এই দীর্ঘ ছিয়াশী বছর পরে আমি আবার তাকে প্রকাশ্যে লোক-চক্ষুর সামনে হাজির করলাম [সঙ্গের প্রতিচিত্রটি দেখুন]।

এই প্রসঙ্গে সতর্ক গবেষক প্রশান্তকুমার পালের "রবিজীবনী" থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি পাঠকদের কাছে—

> এই চিত্রটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা দরকার। একথা ঠিকই যে, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র-ই প্রথম তাঁর "লালন ফকির : কবি ও কাব্য" (১৩৮৬) গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে ও ভিতরে আর্টপ্লেটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ -অঙ্কিত লালনের রেখাচিত্রটি মুদ্রণ করে অনেকের পক্ষে ছবিটি দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন; কিন্তু তিনি যখন লেখেন : 'কেউ-ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা স্কেচটি দেখেন নি একমাত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ছাড়া। এবং তারপর এই দীর্ঘ ছিয়াশী বছর পরে আমি আবার তাকে প্রকাশ্যে লোক-চক্ষুর সামনে হাজির করলাম'। তখন দাবিটি একটু অতিরিক্ত মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত [মৃত্যু : 4 March, 1925] পরিচিত-অপরিচিত অজস্র ব্যক্তির ছবি এঁকেছেন এবং কেউ তাঁর ছবির খাতা দেখতে চাইলে সাগ্রহে তাঁকে দেখতে দিয়েছেন, অনেকের স্মৃতিকথায় এইরূপ উল্লেখ আছে। তাছাড়া অধ্যাপক মিত্র রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির সংগ্রহশালায় লালনের যে ছবি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবির তালিকা দেখেছেন, সেই ছবিগুলি শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে-র সংগ্রহে ছিল এবং শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় 1944-এ তালিকাটি প্রস্তুত হয়। সুতরাং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর অন্তত এঁরা দু'জন যে লালনের ছবিটি দেখেছিলেন, এ-সম্পর্কে সন্দেহ করা চলে না। তাছাড়া অধ্যাপক মিত্র যে লিখেছেন, 'আরও মনে হচ্ছে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা এই স্কেচটি রবীন্দ্রনাথও বোধহয় দেখেন নি'—একই কারণে মেনে নেওয়া শক্ত।[৭]

প্রশান্তকুমারের যুক্তি বিশ্লেষণ সকলের সমর্থন পাবে। তবে তথ্য হিসাবে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে লালন ফকিরের ওই স্কেচ ৮৬ বছর পরে 'প্রথম' প্রকাশের কৃতিত্ব সনৎকুমারের নয়। বস্তুত ১৩৮৩ সালে লালনের ওই স্কেচ প্রথম প্রকাশ করেছেন তুষার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮৪ সালে আমি এবং ১৩৮৬ সালে সনৎকুমার। তিনজনই অবশ্য একই সূত্র (রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির সংগ্রহশালা) থেকে মূল স্কেচের প্রতিলিপি করেছেন।

লালন ফকির সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণা এমনতর নানা বিরোধী বিস্তারে জটিল ও অমীমাংসিত। তাঁর জন্মসাল, জন্মভিটা, জাতিসূত্র সংশয়ের অতীত নয়। তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই, আখড়া ছেঁউড়িয়া এবং মৃত্যু ১৮৯০ সাল—এই তিন তথ্য অসংশয়িত সত্য। তিনি নিরক্ষর ছিলেন এমন মন্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন। তবে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় তাঁর জন্ম উচ্চবর্ণে কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি মেনে নিয়েছিলেন নিম্নবর্গের জীবন। সে কি কোনো গাঢ় অভিমানে না নিগূঢ় লোকায়তের টানে সেকথা আজ কে বলবে? গরিষ্ঠসংখ্যক গবেষক বলেছেন, লালন জন্মসূত্রে হিন্দু। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পরে কোনো-কোনো পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান পণ্ডিত লালনের মুসলিম উৎস নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন অথচ সেখানকার কোনো-কোনো মুসলমান গবেষক সেই প্রয়াসের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করেছেন একথাও সত্য। এব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসবার আগে আমাদের আগে জেনে নিতে হবে লালন সম্পর্কে নতুন ভাষ্য যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের তথ্য ও বক্তব্য ঠিক কী জাতীয়। সেই কথাই এবারে উঠবে। [ক্রমশ

উল্লেখপঞ্জী :

১. পাগলা কানাইয়ের জন্ম ও মৃত্যু সাল অবিতর্কিত নয়। প্রসঙ্গত বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : 'কবি পাগলা কানাই' : ডক্টর মজহারুল ইসলাম। রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৬৬

২. রবিজীবনী : প্রশান্তকুমার পাল। তৃতীয় খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৩৯৪। পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১

৩. রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা : শান্তিদেব ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৭২। পৃষ্ঠা ১১৬

৪. কর্তাভজা, সাহেবধনী ও বলরাম হাড়ি সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : সুধীর চক্রবর্তী লিখিত 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' (পুস্তক বিপণি ১৯৮৪) এবং 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান' (পুস্তক বিপণি ১৯৮৬)

৫. কুষ্টিয়ার বাউল সাধক : আবুল আহসান চৌধুরী। ঢাকা। ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৯০

৬ লালন পরিচিতি : আবু তালিব। ঢাকা। ১৯৬৮। পৃষ্ঠা ১-২

৭. রবিজীবনী : প্রশান্তকুমার পাল। তৃতীয় খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৩৯৪। পৃষ্ঠা ১৩৯-৪০

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩৪ সালে। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। এখানকার সরকারি কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। সংগীত, শিল্পকলা, লোকধর্ম, গ্রামীণ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুশীলন তাঁকে বিশেষজ্ঞের মর্যাদা দিয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণা পুঁথিগত নয়। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাটে ঘুরে-ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন তথ্য আর অভিজ্ঞতা। তাই তাঁর আলোচ্য বিষয় হয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ এবং গভীরতাসঞ্চারী। এযাবৎ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হল : "সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান", "কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ", "গানের লীলার সেই কিনারে", "বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান", "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ", "আধুনিক বাংলা গান", "গভীর নির্জন পথে", "বাংলা দেহতত্ত্বের গান" ইত্যাদি।

প্রসঙ্গ দর্শন

আত্মধারণার প্রযুক্তি : একটি পূর্বাভাষ

(ফরাসি চিন্তাবিদ্ মিশেল ফুকো উত্থাপিত কিছু প্রশ্ন)

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্দিষ্ট সীমারেখা

আলোচনার প্রারম্ভেই প্রবন্ধটির সীমানা কিভাবে নির্ধারিত তা স্পষ্ট করে নেওয়া উচিত। শিরোনামে ব্যবহৃত "পূর্বাভাষ" শব্দটির ব্যাখ্যা করলেই সেই সীমা সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। "পূর্বাভাষ" শব্দটির ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই 'আরো কিছু থাকা' সূচিত করে এবং ঠিক সেই কারণেই এখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। Technology of the Self বা 'আত্মধারণার প্রযুক্তি' বিষয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন / করেন, তাঁদের মতে—এই তত্ত্বটির সম্যক্ উপলব্ধির জন্য ধারণাটিকে কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রবন্ধে উক্ত তত্ত্বটিকে কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ফেলা হয় নি ; সাধারণভাবে তত্ত্বটি কী, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

তত্ত্বটি আলোচনার জন্য মূলত যে ধারণাটির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তা হল "ব্যক্তি" (person / individual / subject)। ব্যক্তির আত্মধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রযুক্তি বিষয়টি আলোচিত। আলোচনার শুরুত্ব পশ্চিমী দর্শনের পটভূমিতে সহজে অনুভব করা যায়। 'আধুনিক' পাশ্চাত্য দর্শন, অর্থাৎ ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত থেকে শুরু হল যে দার্শনিক চিন্তাধারা, সেইটুকুর মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখলেও একটি বিশেষ বিষয় চোখে পড়ে। তা হল, পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার জগতে "ব্যক্তি" বা "আত্ম" বিষয়ে একটি অনড়, অটল ধারণার প্রভাব। দেকার্ত তাঁর সন্দেহাতীত বচন 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি' গ্রথিত করার সঙ্গে-সঙ্গেই পাশ্চাত্য দর্শন বাঁক নেয় ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদী (subjectivistic) ধ্যান-ধারণার দিকে। পরবর্তী কালে জার্মান দার্শনিক কান্ট্ ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদী দৃষ্টিকোণ আরও স্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ করেন। দেকার্তের 'চিন্তাশীল আত্ম' (thinking ego)-র ধারণা তার শীর্ষে পৌঁছয় হেগেলের দর্শনে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, পাশ্চাত্য দর্শনের ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদী ভাবধারার ওপর কর্তৃত্ব করেছে ব্যক্তি বা আত্ম সম্পর্কিত যে অটল ধারণা, সেই ব্যক্তি বা আত্ম-র উপাদানগুলি হয়েছে—পরাতাত্ত্বিক অপরিবর্তনীয়তা, কিছু জ্ঞান-তাত্ত্বিক আকার ও ক্ষমতা, ইচ্ছার-স্বাধীনতা-নির্ভর নৈতিক গুণ এবং যুক্তিবাদী পরিবর্তনশীলতা নামে অভিহিত সামাজিক প্রকৃতি।

অবশ্যই পশ্চিমী দর্শনের ধারার মধ্যেই এই জাতীয় ব্যক্তিসাপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে কিছু আপাত প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা এসেছে সেইসব দার্শনিকদের কাছ থেকে—যাঁদের সহজ ভাষায় "অভিজ্ঞতাবাদী" বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু ব্যক্তি বা আত্ম-কে একটি ইতিহাস-নিরপেক্ষ, সময়-বহির্ভূত, সংস্কৃতি-উর্ধ্ব ধারণা রূপে গ্রহণ করার প্রবণতা উভয় শিবিরেই প্রবল। যুক্তিবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ যে দৃষ্টিকোণ থেকেই আত্ম নিয়ে আলোচনা করা হোক না কেন—সব সময়েই অবশ্যম্ভাবী ভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেভাবে ব্যক্তি বা আত্মকে সংজ্ঞায়িত / বর্ণিত করা হল, তা সব সময়ের, সকল সংস্কৃতির, সমস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য। দেকার্ত-উত্তর পশ্চিমী দর্শনের আত্মবিষয়ক ধ্যানধারণার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়।

আত্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা—দু-ফলা ছুরি

মূলত মনস্তত্ত্ববিদ্‌রূপে খ্যাত উইলিয়ম জেম্‌স্ তাঁর *The Sentiment of Rationality* প্রবন্ধে বলেছেন, সমস্ত দার্শনিকদের মৌলিক প্রবণতাকে দুটি পরস্পরবিরোধী তাত্ত্বিক অবস্থানে ভাগ করা যায়। একটি হল, সারল্য ও ঐক্যের দার্শনিক অনুসন্ধান—যে সন্ধানের মূল লক্ষ্য হল আমাদের চারপাশের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ও বিভিন্নতাকে সরল, একীকৃত ধারণাসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা। অপরটি হল, স্বচ্ছতার সন্ধান, যে অনুসন্ধান আসলে চায় সমস্ত বিশেষগুলির (particulars) পূর্ণতা অনুধাবন করতে। জেম্‌সের এই মন্তব্য পশ্চিমী দর্শনের আত্ম-বিষয়ক আলোচনা সম্পর্কে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়। দেকার্ত-উত্তর পশ্চিমী দর্শনের বিরাট পরিধির দিকে নজর রেখে আত্ম-সম্পর্কিত আলোচনা-গুলিকে দুটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাবেষ্টিত করা সম্ভব : পরাতাত্ত্বিক (metaphysical) ও আচরণগত (behavioural)। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হয় সরলীকৃত একীকরণের উৎসাহ এবং দ্বিতীয়টিতে ফুটে ওঠে স্বচ্ছতা ও স্বাতন্ত্র্য খুঁজে বার করার আগ্রহ। এ বিষয়ে আলোচনা এগোনোর আগেই একটা সম্ভাব্য বিভ্রান্তি দূর করে নেওয়া দরকার। "আচরণ-গত" /behavioural) শব্দটি পশ্চিমী মনস্তত্ত্বের আচরণবাদ (behaviourism)-এর সঙ্গে সমার্থক নয়। বাস্তব মানুষিক আচার-আচরণের ভিত্তিতে একটি ধারণাকে ব্যাখ্যা করার তাত্ত্বিক প্রবণতা বোঝানোর জন্যই বর্তমান প্রবন্ধে "আচরণগত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আত্ম সম্পর্কে পরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন নির্দেশ করা হচ্ছে পশ্চিমী দর্শনের সেই-সমস্ত দার্শনিকের প্রতি—যাঁরা পরমসত্তা (absolutistic self) বিষয়ে নানা ধাঁচ ও ভঙ্গিমার তত্ত্ব সমর্থন করেছেন। এঁদের সকলের আলোচনারই প্রাকল্পিক প্রারম্ভবিন্দু হল এই পরমসত্তা, যা একটি দেশকালনিরপেক্ষ বস্তু ও সব সময়ই পরাতাত্ত্বিক অপরিবর্তনীয়তা দ্বারা বিশিষ্ট—যদিও তার অন্যান্য গুণাবলীতে অল্পবিস্তর ফারাক থাকতে পারে। সেই ফারাকের কারণ হল বিভিন্ন দার্শনিকের তাত্ত্বিক আগ্রহের ভিন্নতা। তবে এঁদের সকলের কাছেই এই পরমসত্তা কাজ করেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বৈচিত্র্যের অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা ঐক্যের আধার রূপে। এই পরমসত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি কিন্তু কখনোই বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ নয়। পরমসত্তার ধারণা পূর্বতঃসিদ্ধ বলেই গ্রহণ করা হয়—যা অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কখনোই লাভ করা সম্ভব নয় ; বরং সব অভিজ্ঞতাই তার পটাবহেই ঘটে। সাধারণ-ভাবে ধারণাটিকে প্রথমে প্রকল্পরূপে গ্রহণ করে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে বহু দার্শনিক 'যৌক্তিক চিন্তন' (rational reflec-tion) আখ্যা দিয়েছেন। দেকার্ত-উত্তর পশ্চিমী দর্শনের বিশাল প্রেক্ষাপটে আত্ম সম্পর্কে এইজাতীয় ধারণার প্রবক্তার সংখ্যা খুব কম নয়।

ঠিক এর বিপরীতে রয়েছেন এমন বহু দার্শনিক, যাঁরা এই ধরনের পূর্বতঃসিদ্ধ আত্মসত্তা স্বীকার করেন না। তাঁরা পর্যালোচনা শুরু করেন অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁদের আলোচনার জন্য আত্মধারণা একটি আবশ্যিক পূর্বকল্প নয়, যা ইন্দ্রিয়ানুভূত জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি করার জন্য অপরিহার্য। বস্তুত, এইসব চিন্তাবিদ্‌রা এইভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খোঁজার বিরোধী ; তাঁরা বরং চান বিচিত্র মানবিক অভিজ্ঞতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে উপলব্ধি করতে। ফলত, তাঁরা চেষ্টা করেছেন আচরণ-গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আত্মধারণার ব্যাখ্যা করতে। অর্থাৎ, বাস্তব মানুষিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কী ধরনের আত্মধারণায় উপনীত হওয়া যায়, সেটাই

নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন এইসব দার্শনিক। তাঁরা সচরাচর শুরু করেন একটি সহজ প্রশ্ন থেকে—'মানুষ যখন "আমি" সর্বনামটি ব্যবহার করে, তখন সে কী বোঝায় ?'—এবং সেই সূত্র ধরেই এগোন।

এই দুই ধারার অসংখ্য দার্শনিকের মধ্যে কোনো সরলীকৃত মিলনরেখা টানার চেষ্টা হাস্যকর। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক ছাড়াও, একই ধারার ভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ বা মাত্রা কোনোটাই কম নয়। পরাতাত্ত্বিক আত্মধারণার সমর্থক দার্শনিকরা কেউ সমস্ত বৈচিত্র্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর-নামক একটি পরমসত্তায়; কেউ আবার অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মসত্তার অস্তিত্ব মেনেছেন; অন্য কেউ হয়তো মানুষের সামাজিক সত্তার ঐতিহাসিকতা নিয়েও আলোচনা করেছেন—যদিও শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দুতে সব ভিন্নতাকে এক করে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারেন নি। অন্যদিকে আচরণগত দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মকে ব্যাখ্যা করেছেন যাঁরা, তাঁরা কেউ-কেউ বলেছেন বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও অবস্থার কাল্পনিক সমষ্টি ভিন্ন কোনো আত্ম নেই; আবার কেউ বলেছেন ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ দ্বারাই আত্মধারণা নির্ধারিত হয়; কেউ হয়তো একথাও বলেছেন যে মানুষের আত্মধারণা গড়ে ওঠার পেছনে সংস্কৃতির প্রভাব কম নয়। তবে এই-সমস্ত দার্শনিককে একই মঞ্চে দাঁড় করানোর জায়গা থাকে কী করে? ঠিক এই প্রশ্নটিরই উত্তর দেন "আত্ম-ধারণার প্রযুক্তি" তত্ত্বের প্রবক্তারা।

আত্ম-ধারণার প্রযুক্তি : কিভাবে ও কেন

একটু খুঁটিয়ে দেখলেই পূর্বোক্ত দুটি চিন্তাধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। দুটির মধ্যেই একই জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান চিহ্নিত আছে, যা মূলত এমন এক জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো যা আবশ্যিকভাবে কতগুলি দ্বিধাবিভক্ত ধারণার (dichotomies) মাধ্যমে কাজ করে; সব সময়ই যার প্রয়াস হল দুটি বিরুদ্ধ ধারণার একটিকে অপরটির অধীন বলে প্রমাণ করা। আত্মধারণা-বিষয়ক আলোচনায়, তা উপরোক্ত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেটির অনুযায়ীই করা হোক না, সব সময়ই আবশ্যিক পূর্বকল্প হল—ব্যক্তির একটা মূর্ত, স্বাধীন আত্মসত্তা খুঁজে পাওয়া অবশ্যই সম্ভব, সে 'যৌক্তিক চিন্তন'-এর মাধ্যমেই হোক আর মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই হোক। একথাও অবশ্যম্ভাবিভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, উভয় পদ্ধতির যে-কোনো একটি প্রয়োগ করে যে আত্মসত্তা নিঃসৃত হল, তা একটি ইতিহাস-সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ সত্তা—স্থানকালসময় যাকে কোনোভাবেই পরিবর্তিত করতে পারে না। বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন ব্যক্তির আমিত্বে সম্ভব বলে যদি বা কখনো মেনে নেওয়া হয়েছে, তার আত্মসত্তার সারবস্তুটিকে অনড়তা এবং অপরিবর্তনীয়তার বাইরে কখনোই ভাবা হয় নি।

যে-সমস্ত দ্বিধাবিভক্ত ধারণা এখানে নিহিত থেকেছে, সেগুলি হল ঐক্য / বৈচিত্র্য, চিরন্তনতা / পরিবর্তনশীলতা, যুক্তি / অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। যে দুটি চিন্তাধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, দেখা যাবে দুটিই এই-সমস্ত বিরুদ্ধ ধারণাদ্বয়ের একটি বা অপরটির সপক্ষে, এবং মূল প্রয়াস হল একজোড়া ধারণার একটিকে অপরটির অধীন বলে প্রমাণ করা। পরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হল, যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের ওপরে ঐক্য ও পরিবর্তনের ওপরে চিরন্তনতাকে স্থাপন করা। অন্যদিকে আচরণগত চিন্তাধারার চেষ্টা হল, অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মসত্তার বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনশীলতাকে রূপায়িত করা।

এই জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানকে একটি উদ্দেশ্যভিত্তিক অবস্থানরূপে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে আলোচনার সিদ্ধান্ত থাকে পূর্বনির্ধারিত এবং তার বিষয় ও পদ্ধতি—দুটিই বাছা হয় সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই।

যুক্তি অথবা অভিজ্ঞতা—যার বিশ্লেষণের ওপরই জোর দেওয়া হোক না কেন, অবস্থানটি আসলে সব সময়ই যুক্তিবাদী। কারণ, ধরে নেওয়া হয় যে, মানবপ্রকৃতিকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিন্যাসরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং বিশ্বাস থাকে যে, সেই বিন্যাসের এমন বিশ্লেষণ সম্ভব যা তার উৎস এবং উপাদান-গুলিকে সংস্কৃতিনিরপেক্ষভাবে সূচিত করতে পারে। এই জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে একজন ব্যক্তি হল এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতানির্ভর-তথা-অভিজ্ঞতাতীত দ্বিজ (empirio-transcendental doublet), যার পক্ষে—সমস্ত জ্ঞানকে যা সম্ভাব্য করে তোলে তার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অন্য ভাষায় বলা যায়, মানবসত্তাকে একটি সংস্কৃতিশূন্য জ্ঞাতার অবস্থায় বসিয়ে দিয়েই এই জ্ঞানতত্ত্বের যা-কিছু আলোচনা। এই সংস্কৃতি-ঊর্ধ্ব আত্মসত্তার পর্যালোচনার মাধ্যমেই মানুষের সর্বজনীন সত্তা—যা কোনোভাবেই ইতিহাস-সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—মূর্ত হয়ে উঠবে, এরকম ধারণা এই জ্ঞানতত্ত্বে প্রচ্ছন্ন।

এই ধরনের উদ্দেশ্যভিত্তিক জ্ঞানতাত্ত্বিক গঠনকে ভাঙার প্রয়াস অবশ্যই করা সম্ভব, যে প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে—সমস্ত পর্যালোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অনড় অটল ধারণাগুলিকে খুঁজে বের করা এবং কেন-কিভাবে সেই ধারণাগুলি সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা। বাস্তবত, এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় তখনই, যখন মনে রাখা হয় যে—সংস্কৃতি-শূন্য কোনো অবস্থা নিছকই অলীক কল্পনামাত্র। মানব-সত্তা কখনোই সংস্কৃতিশূন্যাবস্থায় বিরাজ করে নি, যার ফলে মানুষের কোনো জ্ঞানকে কখনোই সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে স্থাপন করা সম্ভব নয়। এইজন্যই বিভিন্ন ধারার জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনার সংস্কৃতি-নির্ভরতা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে—প্রচলিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা কেন-কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়েই আলোচনা করা সম্ভব এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। এর ফলে বিভিন্ন তত্ত্বকে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সঠিকভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয়। নিজস্ব ঐতিহাসিক যুগের উদ্দেশ্যসাধনেই সাধারণত বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রচলিত বিভিন্ন ধারণাকে সুগ্রথিত করে একটি তত্ত্বাকারে প্রকাশ করাই জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনার কাজ। আবার, এই গ্রথিত করার প্রক্রিয়াতেই সৃষ্ট হয় নতুনতর ব্যবহারিক ধারণাসমূহ। ইতিহাস তথা সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষিক জ্ঞানের এই মিথস্ক্রিয়া চিরকালীন—এর বাইরে কোনো জ্ঞান খুঁজতে যাওয়া অবান্তর।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি মানুষের আত্মধারণাকে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে আত্মসত্তার ঐতিহাসিক বিকাশকে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, আত্ম-সত্তা বিষয়ক সমস্ত পর্যালোচনার একটি জন্মক্রম গঠন করা যায়—যা দেখিয়ে দেবে কিভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক উপাদান তথা শর্তসমূহ মানুষের আত্মধারণাকে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করেছে।

এখানেই সম্ভবত আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। কার্ল মার্কসসহ বহু চিন্তাবিদ ব্যক্তিমানুষের ওপর সামাজিক প্রভাবের কথা বলেছেন। মার্কসীয় চিন্তায় স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হয়েছে—ব্যক্তিমানুষ হল নিজস্ব ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক যুগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং স্বর ও শব্দের সামান্য বিভিন্নতায় এ কথা আরও বহু চিন্তাবিদের তত্ত্বে সমর্থিত। কিন্তু এই-সমস্ত তত্ত্বে জোর দেওয়া হয়েছে বিবিধ কর্তৃত্ব আরোপ করার কলাকৌশল (techniques of dominance)-এর ওপর। সমাজ এবং ব্যক্তিকে দেখা হয়েছে একটি শক্তিমান / শক্তিহীন দ্বিধাবিভক্তি (powerful / powerless dichotomy)-র মাপকাঠিতে, যেখানে সমাজ সর্বশক্তিমানরূপে ব্যক্তিমানুষকে গড়ে নেয় নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আদর্শ মানুষ এমত

চিন্তায় অধিষ্ঠিত থাকে শাসন-শোষণ-বিশিষ্ট সমাজের বাইরে, যার অভ্যুত্থান ঘটতে পারে তখনই যখন সমাজ আদর্শ শর্তগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম। অর্থাৎ, এইজাতীয় চিন্তায় শক্তি (power)-র ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে নেতিবাচক অর্থে, যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে ব্যক্তিমানুষ—হয় সামাজিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে অথবা তার প্রতিবাদে।

যে তিনটি মাপকাঠিতে এই শক্তিকে সাধারণভাবে বিশিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলি হল—শ্রম, জৈবসত্তা এবং ভাষা। এই তিনটি সামাজিক ক্ষমতায় যখন যেভাবে ব্যবহৃত, তখন ব্যক্তিমানুষের সত্তা সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে উপরি-উক্ত ধরনের বিভিন্ন তত্ত্বে। এই প্রসঙ্গে মিশেল ফুকো তাঁর *The Order of Things* গ্রন্থে বলেছেন: 'Man is governed by labour, life and language: his concrete existence finds its determinations in them; it is possible to have access to him only through his words, his organism, the objects he makes—as though it is they who possess the truth in the first place (and they alone perhaps); as soon as he thinks, he merely unveils himself to his own eyes in the form of a being who is already a living being, an instrument of production, a vehicle for words which exist before him'.[২]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া সম্ভব, আত্মধারণার প্রযুক্তিতত্ত্বের প্রবক্তারাও মানুষকে এই একই ভাবে ইতিহাস তথা সংস্কৃতির সম্পূর্ণ হাতের পুতুল বলেই ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। কিন্তু আরও একটু গভীর ভাবে আলোচনা করলে বোঝা যায়, তাঁরা এই শক্তিমান/শক্তিহীন দ্বিধাবিভক্তির বিরুদ্ধে কথা বলছেন; চেষ্টা করছেন মানুষকে এই তিনটি কর্তৃত্ব-আরোপ করার কৌশলের বাইরে থেকে দেখতে। আর ঠিক এখানেই আত্ম-ধারণার প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশ্নটি নিহিত আছে।

বিষয়টি বোঝার জন্য শক্তিরনেতিবাচক ধারণাকে বর্জন করে নতুনতর ইতিবাচক অর্থে শক্তি বিষয়টিকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, শক্তি এমন কিছু নয় যা কখনই ব্যক্তিমানুষের আয়ত্তাধীন হতে পারে না, বরং শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে সমস্ত ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই। সামাজিক এক বা একাধিক শক্তির বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তিমানুষ এই ধারণা বিসর্জন দিয়ে, সমগ্র সমাজকেই বিভিন্ন ধরন এবং মাত্রার বিবিধ শক্তির একটি জটিল ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিমানুষও এই ব্যবস্থারই অন্তরভুক্ত—তার বাইরে নয়। অর্থাৎ, সামাজিক শক্তি বলতে এক ধরনের বাহ্য নিয়ন্ত্রণ—ব্যক্তিমানুষ যার অধীনে মাথানত করতে বা প্রতিবাদে গর্জে উঠতে বাধ্য—বোঝানো হচ্ছে না। বরং শক্তি (power) হল এমন একটি ক্ষমতা (force) যার নিজের মধ্যেই বাধ্যতা ও প্রতিবাদ দুই প্রচ্ছন্ন থাকে—যে ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষমতা কেবলমাত্র কোনো রহস্যজনক সামাজিক জোর-এরই নেই, ব্যক্তিমানুষেরও আছে। শক্তি বিষয়ক এই ধারণার প্রেক্ষাপটেই আত্মধারণার প্রযুক্তি বিষয়টি বোঝা সম্ভব।

"আত্মধারণার প্রযুক্তি" (technology of the self) পদটি মিশেল ফুকো প্রথম ব্যবহার করেছেন তাঁর *History of Sexuality* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং ওই একই বইয়ের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে তথা অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি ধারণাটিকে বিশদ এবং স্পষ্ট করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর ইতিহাসপাঠের মাধ্যমে সমস্ত সমাজেই তিনি একটি বিশেষ প্রযুক্তির অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন, যাকে পূর্বোক্ত তিনটি কর্তৃত্ব আরোপের কৌশলের অন্তরভুক্ত করা যায় না। তাঁর মতে, ব্যক্তিমানুষ শুধু ওই তিনটি কর্তৃত্ব আরোপের

কৌশল দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না; সে স্বয়ং কতগুলি আকার এবং ধরনের (forms and modalities) মাধ্যমে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে এবং সেগুলির সাহায্যে নিজেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে। এই-সমস্ত আকার এবং ধরনগুলিকেই সামগ্রিকভাবে তিনি বলেছেন 'techologies of the self' বা আত্ম-ধারণার প্রযুক্তি। ফুকোর নিজের ভাষায়: 'Techniques which permit individuals to affect, by their own means, a certain number of operations on their own bodies, their own souls, their own thoughts, their own conduct, and this in a manner so as to transform themselves, modify themselves, and to attain a certain state of perfection, happiness, purity, supernatural power. Let us call all these kinds of techniques technologies of the self'.[৩]

প্রযুক্তি-শব্দটির ব্যবহার বিষয়ে আর-একটু ব্যাখ্যা দরকার। সাধারণভাবে প্রযুক্তি-শব্দটি দ্বারা আমরা সামগ্রিকভাবে সেই-সমস্ত কলাকৌশলগুলিকে বুঝি, যেগুলি মানুষ প্রয়োগ করে। করে বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের সুবিধেমত বদলে নেবার জন্যে। একই অর্থে এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে; বোঝানো হচ্ছে সেই সমস্ত কলাকৌশলকে—যেগুলি মানুষ নিজের ওপর প্রয়োগ করে কোনো পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, কোথায় কী ধরনের পরিবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রশ্নে। মানুষের আত্মধারণাগঠনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় এই প্রযুক্তি। যে-সমস্ত উপাদানের সাহায্যে মানুষ নিজেকে একজন স্বাধীন ব্যক্তিসত্তারূপে চিহ্নিত করে, সেগুলির পরিবর্তনের জন্যই প্রয়োগ করা হয় আত্ম-ধারণাবিষয়ক প্রযুক্তি। এই উপাদানগুলি কী হবে এবং কোন্ মানদণ্ডে সেগুলির বিচার হবে—তা সব সময়ই ইতিহাস-সংস্কৃতিসাপেক্ষ। বিশেষ-বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিবিধ সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে আত্ম-কে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ভিন্ন উপাদান এবং মানদণ্ড নির্দেশ করে। কি-ভাবে বিভিন্ন সময়ে মানুষের আত্মধারণা সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তার ইতিহাস রচনা করা সম্ভব; তবে তার জন্যে প্রথমেই দরকার অনড়, অটল, অপরিবর্তনশীল আত্মের ধারণা থেকে মুক্তি। সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ কোনো আত্ম নেই, এমন কোনো দার্শনিক সত্তা নেই যা জ্ঞাতা রূপে রূপান্তরহীন থেকে অন্যান্য সব পরিবর্তন অনুভব করে। সত্তা কী—সেই ধারণাও যুগে-যুগে পালটে যায়, কাজেই সত্তা স্বয়ং সময় এবং সংস্কৃতির সঙ্গে-সঙ্গে পালটায়। আজ আমি 'আত্ম' বলতে যা বুঝি, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তা বুঝতাম না, আবার চতুর্বিংশ শতাব্দীতে আরো অন্যরকম কিছু বুঝতে পারি।

আত্মধারণার প্রযুক্তি বিষয়ক পর্যালোচনা একটি পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক চিন্তাধারা রূপে বিকশিত হবার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এইটুকু মেনে নেওয়া যে, অন্যান্য নানান পণ্য উৎপাদনের যেমন বিভিন্ন উৎপাদনপদ্ধতি রয়েছে—আত্ম বা ব্যক্তিসত্তা উৎপাদনেরও ঠিক সেরকমই নানান পদ্ধতি ঐতিহাসিকভাবে থেকেছে। পাশ্চিমী দর্শন বা অন্য যে-কোনো দার্শনিক চিন্তা-ধারায় কেন-কিভাবে গড়ে উঠেছে অনড়, অপরিবর্তন-শীল, স্বাধীন আত্ম-র ধারণা—সেই বিশ্লেষণ করা দরকার ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের দিকে নজর রেখেই। ফুকো এইজাতীয় পর্যালোচনার প্রধান তিনটি ক্ষেত্র নির্দেশ করেছেন: (১) আত্মবিষয়ক আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট বিজ্ঞান গঠন; (২) যে-কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে কী ধরনের শক্তি-ব্যবস্থা (power-system) আত্মধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা নির্দিষ্ট করা; এবং (৩) যেসব আকার বা ধরনের মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করেছে সেগুলি নির্দিষ্ট করা। মনে রাখা

দরকার, যখন শক্তি-ব্যবস্থা বলা হচ্ছে, তখন শক্তিমান / শক্তিহীন দ্বিধাকরণের বাইরে দাঁড়িয়ে শক্তি বিষয়টিকে বোঝা হচ্ছে।

যাই হোক, এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে তৃতীয়টিকে ঘিরেই আত্মধারণার প্রযুক্তি বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এখানেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব কেন-কিভাবে কী জাতীয় বিষয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ বিভিন্ন সময়ে নিজের আত্মকে বুঝেছে এবং সংজ্ঞায়িত করেছে। প্রথম দুটি প্রশ্নের সমাধান আত্মধারণার উৎপত্তি তথা ক্রমবিকাশ বিষয়ক ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রমাত্র। যে-সমস্ত বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে মানুষের আত্মধারণা সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা এইজন্যই দরকার। একই কারণে দরকার বিচার করে দেখা শক্তি-ব্যবহারের বিভিন্ন ধরন আর কৌশলগুলি – শুধুমাত্র বাইরে থেকেই নয়, ব্যক্তিমানুষের ভেতর থেকেও এই ধরন আর কৌশলগুলি ব্যবহৃত হয় সে কথা মনে রেখে।

অর্থাৎ, আত্মধারণার প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনায় নজর দিতে হবে সেই-সমস্ত মানদণ্ডের দিকে, যেগুলির সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক যুগে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে সংজ্ঞায়িত করেছে—পরাতাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৈতিক ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগের কিছু নির্দিষ্ট 'সত্য' থাকে, কেবলমাত্র যেগুলির নিরিখেই মানুষ নিজেকে একটি সত্তারূপে চিনতে শেখে, সমাজে সক্রিয় থাকতে সক্ষম একজন ব্যক্তিরূপে নিজেকে বুঝতে শেখে। এই সত্যগুলি বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে নির্দিষ্ট হয়। এই দিক থেকে আত্মধারণার প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনাকে 'সত্য-বিষয়ক খেলা'-র (games of truth) বিশ্লেষণও বলা যেতে পারে। কারণ, মানুষের আত্মধারণার ইতিহাসগঠনে মূলত যা করা দরকার তা হল—বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে যে 'সত্য' মানুষের সামনে থেকেছে, সেগুলিকে খুঁজে বের করা। এই-সমস্ত সত্যের মাধ্যমেই মানুষ আত্মর সারবস্তুকে খুঁজেছে যুগে-যুগে। কী সেইসব সত্য, যার সাহায্যে মানুষ নিজেকে একজন জীবন্ত, ভাষা-ব্যবহারে সক্ষম, উৎপাদনক্ষম প্রাণী বলে চিনতে শিখেছে; নিজেকে কখনো সুস্থ, কখনো অসুস্থ, কখনো যৌক্তিক, কখনো পাগল বলে সংজ্ঞায়িত করেছে; নিজেকে অপরাধী বা নির্দোষ বলে ভেবেছে—সেইগুলি নির্দিষ্ট করার মাধ্যমেই রচিত হতে পারে মানুষের আত্মধারণার বিকাশের ইতিহাস।

পূর্বোক্ত একটি কথার পুনরুক্তি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় এই সময়ে। কিভাবে-কেন মানুষ নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন সত্য নানান সময়ে গ্রহণ করেছে, তা ঠিকমতো বিশ্লেষণ করার জন্য একটি আবশ্যিক পূর্বকল্প হল—এ কথা মেনে নেওয়া যে মানুষের কোনো ইতিহাস-সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় স্বাধীন সত্তা নেই, যা সব সময় একইভাবে জ্ঞাতারূপে কাজ করে, নৈতিক মূল্যায়ন করে, ইচ্ছা-অনুভব-আকাঙ্ক্ষা-সমৃদ্ধ প্রাণী-রূপে বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করে। বরং, বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণের বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে বের করা দরকার, কেন-কিভাবে এইজাতীয় দেশ-কাল-সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ সত্তার ধারণা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠতে পেরেছে। পরিবর্তন-ঊর্ধ্ব এই মানবসত্তা-কেন্দ্রিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে ফুকো বলেছেন—তা হল পশ্চিমী-চিন্তাধারার 'নৃতাত্ত্বিক ঘুম' (anthropological sleep), যে ঘুম ভাঙানোর জন্যে আত্মধারণার প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পরিশেষে একটি মন্তব্য করা যেতে পারে। সমগ্র আলোচনায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতেই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আত্মধারণার প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় পর্যালোচনা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা অসম্ভবও নয়, অবাভাবিকও নয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলির দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে—বিভিন্ন দার্শনিক ধারার মধ্যে অল্পবিস্তর ফারাক থাকলেও মানুষের আত্ম-র সারবস্তুকে একটি দেশকালনিরপেক্ষ অনড় অটল স্বাধীন সত্তারূপে সংজ্ঞায়িত করার প্রবণতা বিদ্যমান সবগুলি ধারাতেই। সুতরাং, কোন্ সামাজিক-সাংস্কৃতিক শর্তসমূহের নিরিখে কেন-কিভাবে এই ধারণা গড়ে উঠতে পেরেছিল এবং এই ধারণাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল যে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা, সেগুলি কোন্ সত্যগুলিকে চিহ্নিত করেছিল 'যথার্থ সত্য' বলে—তার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন থেকেই যায়।

উল্লেখপঞ্জী :

১. জেমস, উইলিয়াম : এসেজ ইন ফিলজফি (দ্য ওয়র্কস অব উইলিয়াম জেমস সিরিজ), হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস / প্রবন্ধ : দ্য সেনটিমেনট অব র‍্যাশনালিটি, পৃ ৩৯, ৩৭।

২. ফুকো, মিচেল : দ্য অর্ডার অব থিংগস, ভিনটেজ বুক সংস্করণ / নবম পরিচ্ছেদ : ম্যান অ্যানড হিজ ডাবলস, তৃতীয় বিভাগ : দ্য অ্যানালিটিক ফিনিচ্যুড, পৃ ৩১৩।

৩. ফুকো, মিচেল : মার্শাল ব্লনস্কি সম্পাদিত 'অন সাইনজ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ : সেক্সুয়ালিটি অ্যানড সলিচ্যুড, জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ ৩৬৭।

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১লা অকটোবর ১৯৫৮-য়। প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে পড়াশুনা শেষ করে তিনি অধ্যাপনা করেন কয়েক বছর। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে গবেষক। তিনি ফুকোসংক্রান্ত ইংরাজি প্রবন্ধ লিখেছেন "ইনডিয়ান ফিলোজফিক্যাল কোয়ার্টার্লি'তে।

ঐতিহ্যস্মৃতি ও মধুসূদনের কবিত্ব

সত্যজিৎ চৌধুরী

আমাদের মধুসূদন-চর্চার অ্যাকাডেমিক ধারায় একটা ছক দাঁড়িয়ে গেছে। বাঙলার রেনেসাঁস নিয়ে উচ্ছ্বাস এবং কবিত্বে পশ্চিমী রাজনীতির বশংবদ ধরে নিয়ে মধুসূদনের সৃষ্টি জরিপ করা—এর বাইরে বড়ো একটা দৃষ্টি যায় না। ডক্টর গার্গী দত্ত কাজ করেছেন একেবারেই ভিন্ন অবস্থান থেকে।

মধুসূদনের সৃষ্টির ভুবনে যাবার আলো তিনি মধুসূদন থেকেই দৃষ্টিতে তুলে আনেন। বলেন, '…তবু মধুসূদনের রচনাকে বুঝবার জন্য সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি তাঁর নিজের লেখা চিঠিগুলি থেকে। এই চিঠিগুলিতে সমালোচনার মূল সূত্র, তাঁর নিজের সাহিত্যাদর্শ, শিল্পভাবনা ও মানসপ্রবণতা ধরা পড়েছে। …বস্তুত মধুসূদনের সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য সমালোচক মধুসূদন নিজেই,…।' কোনো কবিকে বোঝার এটাই একমাত্র উপায় কিনা—এমন প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু সমালোচনায় এ অবস্থান নেওয়ায় এক ধরনের কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় ফুটে ওঠে, বিশেষত মধুসূদন-চর্চায়। মধুসূদনের সচেতন আধুনিক মন জীবনের সংক্ষিপ্ত সৃজনপর পর্বটিতে পদে-পদে যে নিজেকে কেমন যাচাই করত—তার বিশদ প্রমাণ রয়েছে চিঠিপত্রে। সদ্য-যুবক মধুসূদন নিজের মধ্যে কেমন আত্মপ্রকাশের আকুলতা বোধ করতেন, কেমনভাবে তিনি প্রতিভার স্বাদ পেতেন এবং ভাবতেন জগতের কবিকুলগুরুদের পাশে জায়গা করে নেওয়াই তাঁর জীবনের লক্ষ্য—এইসব উদ্দীপনার পাশাপাশি সংকল্প গঠন এবং রূপায়ণের জন্য কঠোর প্রস্তুতির তথ্যও রয়েছে তাঁর পত্রধারায়। মানবিক সংস্কৃতির আধুনিকতম বিকাশ কোন্ উজ্জ্বলতম স্তরে পৌঁছেছে জানার জন্য তাঁকে একের পর এক য়ুরোপের প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা শিখতে হয়। সাক্ষাৎ জ্ঞানে তিনি য়ুরোপকে পেতে চান, ব্যবহার করতে চান। আর সঙ্গে-সঙ্গে এও বোঝেন, হয়তো য়ুরোপীয় ভাষাগুলির আধুনিক বিকাশের দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝেন যে, সৃজন-প্রতিভা ফলবান হতে পারে নিজেরই ঐতিহ্যের সঙ্গে সৃজনশীল সম্পর্ক রচনায়, নিজের ভাষায়। ইংরেজি ছেড়ে বাঙলায় ফেরা, পদে-পদে বানান-বিভ্রাট সত্ত্বেও মাতৃভাষারই সুর স্বর পিঁজে-পিঁজে নতুন শিল্পরূপ জাগানোর তন্ময়তায় তিনি মুক্তির স্বাদ পান। ভারতীয় ইতিহাসের সেই বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের পক্ষে আর কস্কিত্বের বিষয়ে, আক্ষিকে অতীতের পুনরাবৃত্তি সম্ভব ছিল না। পূর্বপুরুষের কীর্তি এবং আধুনিক রুচির মান—এর মধ্যে কী বিরাট ব্যবধান! কী করে উত্তরণ সম্ভব! দুঃসাধ্য এই দায় তবু মধুসূদন নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। নিজেরই বোধ এবং সামর্থ্যের উপরে তাঁকে একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল। কেউ সহযোগী ছিল না, কোনো সংঘ ছিল না। ছিলেন কেবল জনকয়েক সহানুভূতিশীল বন্ধুজন—যাঁদের রুচিও মধুসূদনকেই লালন করতে হচ্ছিল। সেই নিঃসঙ্গ ব্রত-পালনের দিনগুলিতে তাঁর নিজেকে মনে হত a proud, silent, lonely man of song। বন্ধু রাজনারায়ণকে লেখেন, 'There never was a fellow more madly after Muses then your poor friend! Night and day I am at them···The Muses before everything' is my motto!

মধুসূদনের রচনায় ভারতীয় উপাদান—গার্গী দত্ত। স্বর্ণরেখা, কলকাতা-৯। পৃ ৪১২+১১। পঞ্চাশ টাকা।

গানে-পাওয়া এই তন্ময় মানুষটিই কবিত্বের দায়ে আপন ঐতিহ্যের মর্ম বোঝার জন্য একাগ্র নিষ্ঠায় কঠোর অনুশীলন করেছিলেন। ভাসাভাসাভাবে সবারই জানা, মধুসূদন সংস্কৃত কাব্যের মহান কীর্তি-গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। বাঙলার কবি জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এবং প্রধান বৈষ্ণব কবিদের জগৎও তাঁর বোধের মধ্যে ছিল। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে তাঁর প্রবেশ ও অধিকার কতটা গভীর ও ব্যাপক—তার কোনো পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা গার্গী দত্তর আগে কেউ করেন নি। দীননাথ সান্যালের টীকায় মধুসূদনের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব দেখানোর তাৎপর্যময় চেষ্টা স্মরণে রেখেও বলা যায়—ডক্টর দত্তর "মধুসূদনের রচনায় ভারতীয় উপাদান" বইটিতে আমাদের মধুসূদন-চর্চার একটি বড়ো ফাঁক পূরণ হল।

পরিশিষ্ট বাদে বইটি পাঁচ অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম: সেকালের সংস্কৃতশিক্ষা ও মধুসূদন; দ্বিতীয়: মধুসূদন-সাহিত্যের সাধারণ বিবরণ, রূপ ও রীতি; তৃতীয়: মেঘনাদবধ কাব্য (প্রতিটি সর্গ ধরে আলোচনা এবং শেষে রাবণ ও রাম-লক্ষ্মণের চরিত্রে পুরাণ-কাহিনী অনুসরণের পরিমাণ); চতুর্থ: অন্যান্য নাটক-কাব্যে পৌরাণিক কল্পনা; পঞ্চম: রচনা-শৈলীতে পুরাণপ্রসঙ্গ। পরিশিষ্টে "পদ্মাবতী", "কৃষ্ণ-কুমারী" এবং "মায়াকানন" সম্পর্কে আলোচনা আছে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত করেছিলেন, 'সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কখনই বিশেষ অনুরাগ বা অধিকার ছিল না।' এই সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করতে হলে মধুসূদনের ছাত্রবয়সের শিক্ষার পরিবেশ এবং উত্তরজীবনের অনুশীলন খতিয়ে দেখতে হয়। কাজটা বেশ মেহনতের, কারণ, তৈরি দলিলপত্র বিশেষ পাওয়া না। মধুসূদন হিন্দু কলেজে ছাত্র ছিলেন ১৮৩৭-৪২ এবং বিশপস কলেজে ১৮৪৪-৪৭। বিশপস কলেজেই তিনি গ্রীক, লাটিন-এর সঙ্গে সংস্কৃত শেখেন। অবস্থা-সংকটে বাঙলা ছেড়ে মাদ্রাজে গেলেন। সেখানে স্বাধীনভাবে যে নানা ভাষা চর্চার বিবরণ গৌরদাস বসাককে জানাচ্ছেন (অগস্ট ১৮৪৯), তার মধ্যে বিকেল ২-৫টা তেলুগু এবং সংস্কৃতের জন্য নির্দিষ্ট দেখা যাচ্ছে। সংস্কৃত-বিদ্যা অনুশীলনের আবহমান পদ্ধতিতে ব্যাকরণের অনুপুঙ্খ একেবারে মুখস্থ করিয়ে তারপরে কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়—এসব শাখায় ছাত্রদের বিশেষজ্ঞ করে তোলা হত। টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা-রীতি সংস্কৃত কলেজে হুবহু অনুসরণ করা না হলেও একটা কঠোর শৃঙ্খলা মানা হত। মধুসূদন সেভাবে কোথাও সংস্কৃত-বিদ্যা শেখেন নি। শুধু সংস্কৃত কেন, গ্রীক-লাটিনও ক্লাসিক্যাল ভাষাচর্চার কঠোর শৃঙ্খলা মেনে শেখেন নি। তার দরকারও ছিল না মধুসূদনের পক্ষে। যা শিখেছিলেন, সেই বনিয়াদের উপরে সারা জীবন ভাষাগুলির সাহিত্যিক কীর্তির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রেখেছেন। এই উৎস থেকে প্রয়োজনমতো উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সাহিত্যিক প্রকাশরূপের উৎকর্ষ ও অব্যর্থতা আয়ত্ত করার জন্য বারবার অধ্যয়ন করেছেন। সংস্কৃত এবং বাঙলা এবং কিছুটা তেলুগু তাঁকে ভারতীয় ঐতিহ্যের জমি চিনতে সাহায্য করে। (বালক বয়সে মুখস্থ করা ফার্সি কবিতার কোনো জের কি তাঁর পরিণত মনে পৌঁছেছিল?) ভাষাচর্চায় তাঁর উৎসাহ শাব্দিক বা ভাষাতাত্ত্বিক হবার জন্য নয়, for the great object of embellishing the tongue of my fathers.

টেকস্ট ধরে আলোচনায় যাবার আগে ডক্টর দত্ত তথ্যে ভরাট করে প্রতিপন্ন করেছেন, কাব্যের ভাষা-শিল্পগত উৎকর্ষ আয়ত্তে আনাই মধুসূদনের মূল অভিপ্রায় ছিল। পুরাণ তাঁকে টানে, কারণ, It is full of poetry। পুরাণের হিন্দুত্ব বা ধর্মীয় আবেদনে তাঁর কোনোই আগ্রহ নেই। বুঝে নেওয়া যায়, এই একই মানসিকতায় তিনি শিল্পশ্রীময় শব্দের খোঁজে "অমরকোষ" কাছে রাখতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের নান্দনিক আবেদন যাচাই করার জন্য "সাহিত্যদর্পণ"

পড়তেন। গার্গী দত্তর এই বিবরণের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ক্রমে স্বচ্ছ হয়, এই এক নতুন কবি ধর্মীয় আবেদন থেকে মুক্ত করে পূর্বপুরুষের কীর্তিগুলি ভিন্ন আলোয় দেখলেন। শুদ্ধ এবং অবিমিশ্র সাহিত্যমূল্য বা কাব্য-মূল্য প্রতিষ্ঠা করে দেবার একাগ্রতায় সম্পূর্ণই নতুন এক নান্দনিক মূল্যজ্ঞান তিনি আশ্রয় করেছিলেন। অবশ্যই পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক ঐতিহ্য বিষয়ে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ভিন্ন এ মূল্যজ্ঞান সংগঠন তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। কথাটা ডক্টর দত্ত কখনও ভোলেন নি, পাঠককেও বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ সচেতনতায় বড়ো মাপের এই বইটির থীম ভারতীয় উপাদানসন্ধান হলেও কোথাও একপেশে ঝোঁক আসে নি। নতুন কালের কাব্য রচনায় নান্দনিক ভাবাদর্শের প্রশ্নে মধুসূদনের অবস্থান যে অসংশয়িত, চিঠিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ অবস্থান আরও স্পষ্ট করে ধরে দেবার জন্য মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রচ্ছদপটে একটি প্রতীক রাখতেন। একদিকে একটি হাতি (প্রাচ্যের প্রতীক), অন্য দিকে সিংহ (পাশ্চাত্যের প্রতীক) এবং সূর্য (কবিপ্রতিভা) পদ্মের (বাংলা সাহিত্য) উপরে আলো বিকিরণ করছে। সঙ্গে থাকত একটি ভাবনা-মন্ত্র, 'শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম'—হয় শরীরপাত নয় কার্যসাধন। অন্য বইয়ের প্রচ্ছদেও থাকত এই প্রতীক। কাব্যাদর্শ সম্পর্কে মধুসূদনের সুস্পষ্ট এই ইঙ্গিত অনুসরণ করে টেক্স্টের আলোচনায় ডক্টর দত্ত বিশিষ্ট প্রয়োগগুলির ভারতীয় সূত্র অনুপুঙ্খে সাজানোর সঙ্গে-সঙ্গে নির্দেশ করার যোগ্য পাশ্চাত্য সূত্রও ধারাবাহিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। গবেষণাপ্রকল্পটির অভিপ্রায় অনুযায়ী অবশ্য ভারতীয় উৎস-নির্দেশই বেশি জায়গা পেয়েছে। মধুসূদন ব্যবহার করেছেন যেসব আখ্যান এবং চিত্রকল্প—তার উৎস-নির্দেশে গার্গী দত্ত কাব্য এবং পুরাণের উপাদান তুলনা করে-করে সাজিয়ে দিয়েছেন। একই গল্প ফিরে-ফিরে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন পুরাণে। কোন্‌টি থেকে কতটা মধুসূদন নিচ্ছেন, কীভাবে মেশাচ্ছেন বিভিন্ন উপাদান—বুঝতে হলে সব সূত্রগুলিই চোখের সামনে রাখতে হয়। যেমন "মেঘনাদবধ কাব্যে"র অষ্টম সর্গে নরকবর্ণনার উপাদান বিশ্লেষণে মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের বিবরণের সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, শিবপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে যেমন, তেমনি ভাগবত ও কৃত্তিবাস থেকে উল্লেখগুলি সাজানো আছে। তারই সঙ্গে রেখেছেন দান্তের প্রসিদ্ধ নরকবর্ণনা। প্রসঙ্গত এসেছে রবীন্দ্রনাথের "নরকবাস" নাটিকার নরকচিত্র। তথ্যসংকলনের এ পদ্ধতিতে খাটুনি প্রচুর, সাজিয়ে ধরাও বেশ কঠিন কাজ। কেউ এ কাজ করে দিলে বিষয় ধরে চর্চার সুযোগ বাড়ে। গার্গী দত্ত যে নিপুণভাবে কাজটি দিলেন—এতে মধুসূদন-চর্চার বোধ বাড়বে।

বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত হলেও মন টানে বিশেষভাবে, কারণ, এখানে আনা হয়েছে মধুসূদনের রচনাশৈলীতে পুরাণপ্রসঙ্গ। শব্দের ধ্বনিগত সৌষম্য বিষয়ে, চিত্রকল্পের অব্যর্থতা বিষয়ে, ছন্দ-রূপ বিষয়ে মধুসূদনের প্রখর সচেতনতার দৃষ্টান্ত মেলে "মেঘনাদবধ কাব্য" রচনার সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা তাঁর চিঠিতে। যেমন, একটি চিঠিতে দ্বিতীয় সর্গ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বরুণানী" নামটি থেকে একটি সিলেবল বাদ দিয়ে "বারুণী" করেছেন। "বারুণী" যে শব্দ-সংগীত জাগায় "বরুণানী"-তে তা আদৌ জাগে না। তবে কেন সংস্কৃতের নিয়ম মানতেই হবে? তেমনি আর একটি চিঠিতে বন্ধুকে বোঝাচ্ছেন 'আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি / শর্বরী' লিখলে 'কুন্তলার'-র যুক্তবর্ণ 'ল্যা'-এর জোর নষ্ট করে দেয়। 'আইলা সুচারু তারা, শশীসহ হাসি/ শর্বরী" লিখলে কি শব্দসংগীতে আরও সুষমা ফোটে না?—এই অতৃপ্তি আসে প্রকাশ-রূপের শিল্পগত গুণ সম্পর্কে এক নতুন বোধ থেকে। তাই সংস্করণে-সংস্করণে তিনি লেখার পরিমার্জনা করে চলতেন।

ভাষাশিল্পের এই সূক্ষ্ম বোধ নিয়ে কাজ শুরু করেই মধুসূদন অনুভব করেছিলেন, ভারতচন্দ্রে বা লোকরঞ্জক কবিগান পাঁচালির ভাষাতে তাঁর প্রয়োজন মিটবে না। তাঁর কবিত্বের আধার এক স্বতন্ত্র শিল্পিত-ভাষা তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে। শব্দসংগীতে ছন্দিত বহমানতা আনতে হবে। এই গরজে তিনি অমিত্রাক্ষরের পরীক্ষায় যান এবং চরণের শেষের মিলের ঠেকা তুলে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে পাঠক-শ্রোতাকে এক হাজার বছর-ব্যাপী সংস্কার থেকে একেবারেই ভিন্ন রুচির স্তরে নিয়ে যাবার দায় এসে পড়ে। কানকে বুঝ দিতে হবেই। তাই তাঁর অমিত্রাক্ষরে উচ্চাবচ ধ্বনির তরঙ্গ বহাতে প্রচুর, প্রচুর তৎসম-শব্দময় বাক্য সাজাতে হয়। বাঙলার স্বাভাবিক শব্দসংগীত থেকে কি একটু বেশি দূরেই সরে যায় না এই প্রয়োগরীতি? এ অসমতার জের মধুসূদনের রচনায় অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। অতৃপ্তিতে ভোগেন এবং ক্রমাগত তাঁকে বাক্যের বিন্যাসে, চালচলনে ভাঙাগড়া করতে হয়। প্রকাশরূপের সহতি তো চাই। সেই গরজে তাঁকে উপমা-উৎপ্রেক্ষার উপাদান আনতে হয় পুরাণ থেকে, মহাকাব্য থেকে, কখনও-বা গ্রীক-লাটিন কাব্যের উপাদান সংস্কৃত বা বাঙলারই প্রাচীন বেশ পরে আসে। যেখানে তিনি উপলব্ধিকে এমন প্রাচীন উপাদানেই অব্যর্থ করে তুলতে পারেন, সেইসব অভিব্যক্তি বাঙলার আধুনিক কবিত্বে হীরা যেন-বা। হয়তো "বীরাঙ্গনা"য় এই শিল্পসিদ্ধি বেশি। কখনও-কখনও "চতুর্দশপদী"তেও তেমন হীরক-দ্যুতি পাই। রুচিভেদে দৃষ্টান্ত-চয়ন ভিন্ন হবে। তবু গার্গী দত্ত পুরাণ-আশ্রিত অভিব্যক্তির যে তালিকা তৈরি করে-ছেন (পৃ ৩২২-৬২) সেটি এই ধারায় কাজ করার পক্ষে তাঁর নিজের বা ভিন্ন কোনো গবেষকের উপকারে আসবে।

কাব্যশৈলীর আলোচনা প্রসঙ্গেই বিষ্ণু দে-র "মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স" প্রবন্ধটি মনে পড়ে। আজও নতুন করে বিবেচনাযোগ্য বহু ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ এই অসামান্য রচনাটিতে বিষ্ণু দে মনে করিয়ে দিয়ে-ছিলেন, 'মাইকেলের কবিতায় অসমতার কারণ নির্দেশ শেষ অবধি পাঠককে কবিতার বাইরে নিয়ে যায়। কেন তাঁর খণ্ডকল্পনা প্রচণ্ড কাব্যাবেগ সত্ত্বেও সংকল্পনায় গঠিত হয় না, সে বিচারের দায়িত্ব নিশ্চয় কবির একলার প্রাপ্য নয়; তাঁর যুগও ওই ভঙ্গিলতার জন্য দায়ী।…

'বড় কথা হচ্ছে ঐ কবিত্ব…। এবং এ কবিতা প্রাণ পেয়েছিল ইএট্‌স-কথিত সেই মহাজননীতে, যুগ-যুগান্তব্যাপী জাতীয় জীবনে তার ভাঙন সত্ত্বেও, সমগ্র দেশের মানুষের স্মৃতিমন্থনে মিথস্ বা পুরাণ-কাহিনীতে, মাতৃভাষায়, লৌকিক কাব্যে, রূপকথায়, যে স্মৃতির ঐশ্বর্যবিস্তার ও তীব্রতা ইঙ্গ-জাগরণের আগে ও তার পরিধির বাইরে দেশ-কালে ব্যাপ্ত।'

মহৎ কবিমাত্রেই এ মহাজননীর অঙ্কে আশ্রয় চায়, মধুসূদনও চেয়েছিলেন। মধুসূদন-প্রতিভার শিকড়ের সন্ধানে গার্গী দত্ত একটি বড়ো মাপের কাজ করলেন।

ভাষাচার্য স্মরণে প্রবন্ধসংকলন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

নৈহাটির যান্মাসিক সাহিত্যপত্রিকা "প্রৈতি"র ভাষাচার্য সুনীতিকুমার সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এই বলে খেদ করা হয়েছে যে তাঁর ৭০ বা ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় দেশবাসী কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করে নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে "প্রৈতি"-র এই বিশেষ সংখ্যাটিকে আর-একটু যত্ন করে ও খরচ করে সাজালে এটাকেই তাঁর স্মরণে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ-

প্রৈতি—ভাষাচার্য সুনীতিকুমার সংখ্যা। ১ হরিদাস ঘোষ রোড, নৈহাটি, উত্তর-চব্বিশ পরগনা। কুড়ি টাকা।

সঙ্কলন বলে দাবি করা যেত। এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান প্রবন্ধগুলির মধ্যে মৃণাল নাথের 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়', শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উনিশ শতকের ঐতিহ্য এবং সুনীতিকুমার', সুধীর চক্রবর্তীর 'সুনীতিকুমারের সঙ্গীতভাবনা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত', অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'ভাষাবিজ্ঞানের ত্রিমুনি : যাস্ক, পাণিনি ও সুনীতিকুমার', বীতিহোত্র রায়ের 'রবীন্দ্র অনুষঙ্গে সুনীতিকুমার' এবং এ. কে. মোনজুর মোরশেদের 'ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়' বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকপাত করে সুনীতিকুমারের অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছে—অবশ্য প্রবন্ধগুলির ঝোঁক সুনীতিকুমারকে প্রধানত ভাষাতাত্ত্বিক রূপেই দেখাবার দিকে—যদিও পবিত্র সরকার 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : শত মনীষার সমাহরণ' প্রবন্ধে সহজ ভাষায় ও ভঙ্গিতে লিখেছেন,'বিশ্বমানবের যা সফলকৃতি, যা মহৎ ও সুন্দর তার সবকিছুতে অংশ নিতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর সুউচ্চ সর্বব্যাপী রূপের দিকে আমরা অপার বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। তাঁর দিকে চেয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে বড় বেশি সচেতন হই আমরা।' এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটির লেখকের কাছে প্রশ্ন আছে—তিনি যে 'উপদেষ্টামণ্ডলী', 'চিহ্নিতকরণ', 'বয়োঋদ্ধ' প্রভৃতি শব্দব্যবহার করেছেন সেগুলিকে 'উপদেষ্টমণ্ডলী', 'চিহ্নিত করা', 'বয়ঋদ্ধ' লেখাই উচিত নয় কি?

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও এই সংখ্যাতে প্রবাল দাশগুপ্তের 'বাঙলা ইয়ত্তাবাচক পদের গতিবিধি আর অভিধেয় অবধেয়' এবং পূর্ণচন্দ্র থৌদমের 'মণিপুরী ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু তথ্য' নামে দুটি প্রবন্ধ আছে, প্রবন্ধ-দুটি সুনীতিকুমারের বিষয়ে নয়, কিন্তু সুনীতিকুমারের প্রাথমিক আগ্রহের অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়ে এবং ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। প্রবালের প্রবন্ধের নাম থেকে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যদি বোঝা না যায় তাই তিনি বিষয়বস্তুটির ব্যাখ্যা প্রবন্ধের শুরুতেই দিয়েছেন। কোয়ানটিফায়ারকে অরিন্দম চক্রবর্তী বাঙলাতে 'ব্যাপ্তিমানক' বলেছেন কিন্তু প্রবাল দাশগুপ্ত বলেছেন 'ইয়ত্তাবাচক', কারণ জলের মতো পরিমেয় বিশেষ্য আর চিঠির মতো গণনীয় বিশেষ্য এই দু-রকম বিশেষ্যই ইয়ত্তাবাচকের আওতাতে আসে; আর সাবজেক্টকে অভিধেয় ও অবজেক্টকে বলেছেন অবধেয়। এক-এক ভাষার বৈশিষ্ট্য কেমন করে যুগে-যুগে দেশে-দেশে বিভিন্ন ভাষার ভিড়ে লুকোচুরি করে বেড়ায় তার উপর গোয়েন্দাগিরিতে সুনীতিকুমারের আগ্রহ ছিল আর প্রবাল একই পদ কেমন করে বিভিন্ন বাক্য-বিন্যাসের ভেতরে ঘুরেফিরে বেড়ায়, তার উপর গোয়েন্দাগিরিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। একে বাক্যের গঠনপ্রক্রিয়ার অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ বলতে পারি। সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব ছিল অন্যরকমের।

সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব কী রকম ছিল তার বিশদ পরিচয় দিয়েছেন মৃণাল নাথ। তাঁর প্রবন্ধের নাম থেকে তাঁর রচনাবস্তুর পরিধি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় না। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি বোঝা যাবে এরকম কোনও জটিল ও বিশাল নাম না দিয়ে 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়'কেই একটি প্রতীকী জোড়া শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সব মতের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিকরা একমত হবেন কিনা সন্দেহ। যেমন তিনি বলেছেন, 'চর্যাগীতি প্রাচীন বাঙলাই নয়।' তাহলে কী? 'প্রাক্-নব্যভারতীয় আর্যভাষা হচ্ছে চর্যাগীতি।' তার মানে কি চর্যাগীতি আসলে আর্যভাষার এক সান্ধ্য পর্ব? এক, দুই, তিন করে তিনি ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমারকে বারোটি খণ্ডে ভাগ করেছেন। শেষ চারটি খণ্ড সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক। অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি, দৈনন্দিন জীবনে ভাষাপ্রয়োগের প্রশ্ন ইত্যাদি সম্পর্কগুলি নিয়ে শেষ চারটি খণ্ডে আলোচনা করেছেন।

সুনীতিকুমারের দুটি রচনা নিয়ে নিবিড় আলোচনা করেছেন দেবেশ রায় ও বিজলি সরকার—প্রথম জনের আলোচ্য রচনা হল "ও ডি বি এল", শেষোক্ত জনের আলোচ্য রচনা "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ।" এই দুটি গ্রন্থনিষ্ঠ প্রবন্ধ নিয়ে একটু আলোচনা করা যায়। দেবেশ রায়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁর প্রদত্ত প্রস্তাবটি বোঝা কঠিন। "ও ডি বি এল"-এর মুখবন্ধ থেকে গ্রিয়ার্সনের দুটি বাক্য উদ্ধার করে তিনি বলেছেন যে ইউরোপীয় শিক্ষক আর সুনীতিকুমারের মধ্যে সার্থক বিনিময়ের ফল "ও ডি বি এল" মহাগ্রন্থ। 'কিন্তু আজ ১৯৯১-এ আমরা যদি ও ডি বি এল-এর ভিতর দিয়ে পুনর্যাত্রা করি তাহলে সেই সুখী বিনিময়ের গৃহকোণে পৌঁছব না।···সুনীতিকুমার যখন সুখী বিনিময়ের এই সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন তখন তার নির্মাণপদ্ধতির মধ্যেই রোপিতরেখেছিলেন সৌধটির ধ্বংস, অচেতনে।' এই উক্তিটির অর্থ কী? কেনই বা কমা দিয়ে লেখা হয়েছে 'অচেতনে'? এ কি সংস্কৃতনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বাঙলার নিদর্শন? সংস্কৃতনিরপেক্ষ বাঙলার স্বাতন্ত্র্যকে সুনীতিকুমার জ্ঞাতসারে না অজ্ঞাতসারে প্রতিপন্ন করেছিলেন? সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার সংযোগ সম্বন্ধে (যার নিদর্শন পাই বঙ্কিমী সাহিত্যে) সুনীতিকুমার যেমন সচেতন ছিলেন, বাঙলার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধেও (যার নিদর্শন পাই হুতোমি সাহিত্যে) তিনি তেমনই সচেতন ছিলেন বললে কি দেবেশ আপত্তি করবেন? শুধু তা-ই নয়, সংস্কৃতপোষিত বাঙলা এবং সংস্কৃতনিরপেক্ষ বাঙলা—এই দুরকম বাঙলারই তিনি একজন প্রধান শিল্পী ছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম পেঁচা, বিবেকানন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—এঁরা খাঁটি বাঙলার ধারাকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং সুনীতিকুমারের "দ্বীপময় ভারত", "পথচলতি" "বৈদেশিকী", "জীবনকথা" প্রভৃতি ওই বাঙলারই নিদর্শন।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার সংযোগটা যাঁরা জানেন তাঁরাই বাঙলার স্বতন্ত্র মহিমাকে জানেন। সংযোগটাকে না জানলে কি স্বাতন্ত্র্য জানা সম্ভব? দেবেশ রায় মশায় কি এই সংযোগটা জানেন? তাঁর জানা না-জানা সম্বন্ধে আমার খট্‌কা লেগেছে 'পুনঃপ্রয়োগ' (পৃ ৪৯), 'স্বতোপ্রকাশিত' (পৃ ৫২) 'প্রসারতা' (পৃ ৫৩) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখে। তা ছাড়া বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে দেবেশের ধারণাও গ্রাম্য বলে মনে হয়। তা না হলে 'দেওয়া' অর্থে 'দেয়া', 'নিই' অর্থে 'নেই' প্রভৃতির ব্যবহার কেন?

সংস্কৃত-বাঙলার বিচিত্র বিরহ-মিলন-কথা সুনীতিকুমার বুঝতেন বলেই ১৯৩৯ সালে 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে'-র ভূমিকাতে লিখেছিলেন, 'আমি যথারীতি বাঙ্গালার সংস্কৃত শব্দাবলীর বিচার করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ধ্বনি ও উচ্চারণ এবং ব্যাকরণঘটিত বাঙ্গালার বিশিষ্ট বা স্বকীয় নিয়ম বা পদ্ধতি নির্ণয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।' তাই এপিক নির্মাণ ও ধ্বংসের যে-নাটকের উল্লেখ দেবেশ করেছেন তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় জাগে। প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি স্বকীয় বাঙলাতে আধুনিক কালের পাঠকের কাছে "ও ডি বি এল"-কে 'এক রোমাঞ্চকর বই' হিসেবে রেখে স্বকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করেছেন, 'এই বই যে-তত্ত্বের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে, এই বইয়ের এমন এক পাঠোদ্ধার সম্ভব যাতে সেই তত্ত্বটাই ভেঙে যায়।' এই অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন কুহেলিকাপ্রতিম মন্তব্যের তাৎপর্য কী? তিনি কি স্পষ্ট করে জানাবেন উল্লিখিত তত্ত্বটা (যাকে আগে তিনি 'প্রাচ্যবিদ্যা' ও 'অধিবিদ্যা' বলেছেন) কী এবং "ও ডি বি এল"-এর কী রকম পাঠোদ্ধার করলে তত্ত্বটা ভেঙে যায়? প্রবন্ধটি অবশ্য বেশ সুখপাঠ্য। সেটাই এর গুণ।

এবার বিজলি সরকারের 'হরপ্রসাদের ব্যাকরণচিন্তা ও "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রসঙ্গে দু-চারটে কথা বলি। তাঁর প্রবন্ধের একাদশ পৃষ্ঠার ('প্রেতি'র ১২৫ পৃষ্ঠার) নীচের অংশে তিনি লিখেছেন, 'সুনীতিকুমারের ব্যাকরণ লেখার ৩৮ বছর আগে হরপ্রসাদ বাঙলা ব্যাকরণের রূপরেখা কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত আধুনিক কথাবার্তা বলে-

ছিলেন—তাকে সুনীতিকুমারের মতো পণ্ডিত ভাষাবিদও এড়িয়ে গেলেন।' যে কাজ রবীন্দ্রনাথ-হরপ্রসাদ এড়িয়ে গেছেন সে-কাজ সুনীতিকুমারও এড়িয়ে যেতেই পারেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি এড়িয়ে গেছেন? যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে এককভাবে বাঙলাতে এসেছে সেসবের বিশ্লেষণে সংস্কৃতের নিয়ম-গুলিকে সুনীতিকুমার ভাঙেন নি বলেই কি বিজলি সরকার ঐ এড়িয়ে যাওয়ার কথাটা তুলেছেন? সুনীতিকুমার ঐ ক্ষেত্রে সংস্কৃতের নিয়ম জানা উচিত বলেই মনে করতেন। তা ছাড়া তিনি তো উচ্চারণের ঝোঁক ও ধারাগুলির ব্যাখ্যা করেইছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা কথাবার্তার ভাষাতেই খাটে। লিখিত বাঙলার সন্ধির রহস্য সংস্কৃত নিয়ম ছাড়া বোঝানো কি সম্ভব? ইস্কুলে বাঙলা সাহিত্য বলে আমরা যা-যা পড়ি তার অনেকাংশই সংস্কৃত নিয়মকানুন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ইস্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণ খিচুড়িমার্কা হতে বাধ্য। সার্থক বাঙলা ব্যাকরণ সুনীতিকুমার লিখতে পারেন নি বলে এর আগে একবার শিশিরকুমার দাশ আক্ষেপ করেছিলেন এবং "প্রৈতি"র বর্তমান সংখ্যাতে একই আক্ষেপ করেছেন বিজলি সয়কারও। শিশিরকুমার দাশ মহাশয়ের বক্তব্যের প্রসঙ্গে এই "প্রৈতি"তেই মৃণালনাথ লিখেছেন, 'সন্দেহ হয় দাশ মহাশয় "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" পড়েছেন কিনা। কারণ "ভাষাপ্রকাশ"ই বাঙলা ভাষার প্রথম সার্থক এবং, বলতে দ্বিধা নেই, এযাবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ।' বিজলি সরকারের প্রবন্ধটির প্রসঙ্গেও মৃণালের মন্তব্যটিকে ব্যবহার করা যায় কিনা তার বিচার শ্রীমতী সরকার নিজেই করে দেখতে পারেন।

সুনীতিকুমার 'ভাষাপ্রকাশ' লেখেন ১৯৩৯ সালে এবং এই প্রেক্ষিতটাকে মৃণাল মনে করিয়ে দিয়েছেন। "ভাষাপ্রকাশ"-এর পর থেকে সুনীতিকুমার আস্তে-আস্তে ভাষাতত্ত্বের থেকে ভারতবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও মানবিক বিদ্যার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে থাকেন। ভারতীয়তার তিনি এক নতুন সংজ্ঞা দেন 'কিরাত-জন-কৃতি', 'ইণ্ডিয়ানিজম' প্রভৃতি গ্রন্থে। তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক (ধর্মীয় সাধনাও যার আওতায় আসে) সমন্বয়ই ভারতীয়তার মূল কথা। এই ভারতীয়তার অনিবার্য গতি বিশ্বজনীনতার দিকে। সুনীতিকুমারের প্রথম অর্ধেক জীবন গেছে বাঙলার স্বাতন্ত্র্য সন্ধানে, বাকি অর্ধেক গেছে বিশ্বকুটুম্বিতার সন্ধানে। কিন্তু তাঁর বাকি অর্ধেক জীবনের প্রতি 'প্রৈতি'র সম্পাদকমণ্ডলী তেমন গুরুত্ব দেন নি। তবে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমারের পরিচয় তুলে ধরার জন্যে এবং ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে 'প্রৈতি'কে অভিনন্দন জানাতেই হবে। আজ পর্যন্ত সুনীতিকুমার বিষয়ক যতগুলি বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে তার মধ্যে বোধহয় এই-টেই শ্রেষ্ঠ সংকলন। ইচ্ছে ছিল শুভেন্দুশেখর ও অজিত-কুমারের প্রবন্ধ দুটির একটু পরিচয় দেওয়ার—প্রবন্ধ দুটি এই সংকলনের সম্পদ—কিন্তু স্থানাভাব বলে প্রবন্ধ দুটির সম্বন্ধে এর বেশি কিছু বলা গেল না।

সবশেষে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটু আত্ম-প্রচার করি। সুনীতিকুমারের উপরে গ্রন্থের অভাব নিয়ে দুঃখ করার পরে 'প্রৈতি'র সম্পাদক যে-তালিকা দিয়েছেন তাতে আমার লেখা 'ইন কোয়েস্ট অভ ওয়র্ল্ড কলচর : সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি' এবং 'ছোটদের সুনীতিকুমার' বই দুটির নাম নেই দেখে দুঃখ পেলাম। প্রথমটির দীর্ঘ আলোচনা "স্টেটসম্যান" পত্রিকাতে বেরিয়েছিল ও অন্য একটি আলোচনা করেছিলেন স্বয়ং সুকুমারী ভট্টাচার্য এবং অন্যটি সুনীতিকুমার ভাষা সমাজ ও সংবাদ প্রকাশন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি প্রকাশিত—এতে সুনীতিকুমারের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অর্থাৎ প্রস্তুতিপর্বের বিশদ বিবরণ আছে। তবে সত্য এই যে দেশবাসীর কাছে সুনীতিকুমারের যে-অভিনিবেশ ও গুরুত্ব প্রাপ্য তার কিছুই তিনি পান নি; মনে হয় যে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় তাঁর ভূমিকার জন্যে হিন্দি রাজনীতিবিদরা তাঁকে বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দিতে

ব্যগ্র। আজ যখন দিকে-দিকে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে জাগাবার জন্যে হোমযজ্ঞ চলছে তখন সুনীতিকুমারকে গভীরভাবে অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং চর্চা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ তিনি আমাদের স্বাস্থ্যকর বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তথ্য ও সত্যের আলো দেখান।

নজরুল-পূর্ব শাক্তভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের কথা

গৌতম নিয়োগী

হৃদয়মন্দিরে দাঁড়াও।
শ্যামা রূপে হে শ্যাম শশি।
ত্যজে বাঁশী ধর অসি লোল জিহ্বা অট্টহাস॥
পীত ধড়া ত্যজ্য করে বেড় কটী নর করে,
দৈত্যের মুণ্ড করে ধরে ঘুচাও ভক্তের মন মসি।
ত্যজিয়া শ্যাম বনমালা গলে পর মুণ্ডমালা,
পরিহরি মোহন চূড়া, হয়ে দাঁড়াও এলোকেশী।

ভক্তিরসাশ্রিত এই বাঙলা ধর্মসংগীত বা শ্যামাসংগীতটি কোন্ ভক্ত কবির রচনা? আজ কোনো বাঙালি পাঠক-পাঠিকা বা সংগীতানুরাগীর পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। যাঁরা অনুমানে বলবেন মধ্য-যুগের কোনো হিন্দু ভক্ত কবি এ গান লিখেছিলেন, তাঁদেরও ঠকতে হবে। বস্তুত এই গীতরচনা করেছিলেন উনিশ শতকে, বাঙলার তথাকথিত নবজাগরণের যুগে, এক আশ্চর্য সমন্বয়বাদী ও উদার কবি-গীতকার, ধর্ম যাঁর ইসলাম, পরিচয়ে যিনি বিশুদ্ধ মানুষ। তাঁর নাম মুনসী বেলায়েত হোসেন। যাঁর সম্পর্কে "হিতবাদী" পত্রিকা একবার মন্তব্য করেছিল (১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ৮ পৌষ সংখ্যা): 'মুসলমানের লিখিত বাঙালা নির্দোষ হয় না বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, আমরা তাঁহাদিগকে মুনসীজি প্রণীত সংগীতগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সংগীতগুলিতে ভাষা-জ্ঞান ও কবিত্ব উভয়ই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।' বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো মানুষের পক্ষে হিন্দুধর্মাশ্রিত বা দেবভক্তিসম্বিত সাহিত্য বা সংগীত রচনা করা অসম্ভব, এমন নির্বোধ, গোঁড়া ধারণা অবশ্য কোনো সাম্প্রদায়িক হিন্দুও করবেন না। কারণ সংগীতকার হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই যাঁর স্থান, সেই কাজী নজরুল ইসলামের অসংখ্য গীতের মধ্যে প্রায় আড়াইশো শ্যামাসংগীত আছে। কিন্তু উদার মানবতাবাদী নজরুলকে কেউ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম মনে করলে, তা-ও হবে ভ্রান্ত অনৈতিহাসিক ধারণা। শুধু পূর্বোক্ত কবি মুনসী বেলায়েত হোসেন নন, বাঙলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক মুসলমান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁরা সহজ সরল বাঙালির স্বভাব অনুসারেই, দেশ কিংবা আরাধ্য দেবতার প্রতি মাতৃভাব আরোপ করে গীত রচনা করেছেন। বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনেকেই করেছেন। বিশেষত প্রয়াত অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের দুখানি বই সুপরিচিত("বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্নমুসলমান কবি," ২য় সং, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ এবং "বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্নমুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪)। কিন্তু নজরুল-পূর্ব শাক্ত-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোনো আলোচনাই হয় নি। সেই অভাব অসাধারণ দক্ষতায়, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় পূরণ করছেন শ্রীঅমিয়শঙ্কর চৌধুরী তাঁর "মুসলিম কবির শ্যামাসঙ্গীত" শীর্ষক সমালোচ্য গ্রন্থে।

লেখক জানিয়েছেন: 'বাঙলার সাহিত্যসংসারে অনেক চিত্তাকর্ষক সাহিত্যকর্ম আমাদের নজরে

মুসলিম কবির শ্যামাসঙ্গীত—অমিয়শঙ্কর চৌধুরী। ফ্রেন্ডস পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯। পঁচিশ টাকা।

আসে, যেগুলো সাধারণ ফর্মুলামাফিক নয় এবং প্রচলিত ধারার বিপরীত। Fact is stranger than truth [লেখক এই ইংরিজি প্রবাদটির বিকৃতি করেছেন, শুদ্ধ পাঠ Truth is stranger than fiction]—বলতে যা বোঝায় অনেকটা যেন সেই রকমই ব্যাপার হচ্ছে মুসলিম কবির শ্যামাসঙ্গীত। এই কবিদের সবাই বর্তমানের কৃত্রিমতার, "লোক দেখানো" যুগের নয়; যার জন্য তাঁদের চিন্তাধারা আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' এই আকর্ষণ এবং প্রয়াত অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ও প্রেরণায় লেখক এ কাজ করে সকল বাঙালির আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ জোরদার হয়, যদিও ভারতবর্ষের সঙ্গে ইসলামের যোগ আরো বহু আগে থেকেই। ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে এই সংস্পর্শের প্রভাবে আরো প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা নবজন্ম লাভ করে এক উন্নততর নব্য সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত, সাহিত্য-ইতিহাসচর্চা প্রমুখ নানা মাধ্যমে। আদি মধ্যযুগের ভারতের ধর্মজগতে আমরা দেখি ভক্তিবাদী আন্দোলনের ঢেউ, যার প্লাবনের অভিঘাত এসে লাগে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা তথা সামাজিক কাঠামোর উপরে, বিশেষত সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে তাই মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকদের দ্বারা উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের নানা অঞ্চল জুড়ে যে মানবতাবাদী ভক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তা ছিল শাস্ত্রবিরোধী, প্রথাবিরোধী, ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন তথা জাতিভেদের নাগপাশ-বিরোধী এবং সেই ভক্তিবাদের ফলাফল যাই হোক, তা নিশ্চিতভাবে হিন্দু ও মুসলমান রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উপর আঘাত করেছিল, এ কথা যেমন নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হয়, তেমনি এ কথাও সত্য বলে মেনে নিতে হয় যে কেবলমাত্র সরল, উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলনকে পর্যবেক্ষণ করে ভাববাদী ব্যাখ্যা করলে, চোরাবালিতে আন্দোলনের চরিত্রবিশ্লেষণ হারিয়ে যাবে। কারণ, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এইসব ধর্মীয় আন্দোলনের পিছনে অবশ্যই আর্থ-সামাজিক কারণ লক্ষ করা যায়; প্রায়শই এই আন্দোলনের মধ্যে সমাজের ভিত্তিমূলে শিকড় খুঁজলে দেখা যায় যে নানা ভক্তিবাদী ধর্মগোষ্ঠী, নানা গৌণ তথা লোকধর্মের সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্বে সমাজের উচ্চবর্ণীয় সামাজিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রাম কাজ করেছে। সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লেখেন অনেকেই এদিকে দৃষ্টি দেন না। এক্ষেত্রে অমিয়শঙ্কর চৌধুরী সঠিক। তাঁর মন্তব্য: 'মুসলিম কবিদের শ্যামাসঙ্গীত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা দরকার। কেননা এটা সেই ভক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত খুব ছোট্ট একটা ঢেউ। এর নিজস্ব একটা আর্থ-সামাজিক কারণ আছে। এই আর্থ-সামাজিক কারণ কবিদের মধ্যে কাজ করেছে। যে সামাজিক বিভেদ ও অসাম্য, অনৈক্য ও অসহিষ্ণুতা কবিদের বিবেককে কুরে-কুরে খেয়েছে, তাই তাদের হৃদয়ে বেদনার জন্ম দিয়েছে। এই বেদনার ফলশ্রুতি ধর্মীয় আচরণমণ্ডিতরূপে উপস্থিত হয়েছে (পৃ ১১)।

লেখক একশ পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার স্বল্পায়তন গ্রন্থটিকে প্রধানত দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বিষয়টি সাজিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'উপক্রমণিকা', তার মধ্যে লেখক মুসলিম কবির শ্যামাসংগীত বিষয়ে আলোচনা করেছেন, বিশেষত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক বিকাশের সামাজিক পটভূমিকা ধরতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি

আলোচনা করেছেন সাতজন মুসলমান কবিকে নিয়ে, যাঁরা অন্তত সতেরোটি শ্যামাসংগীত রচনা করেছিলেন। এই সাতজন কবি যথাক্রমে নওয়াজিস খান, আলি রজা, আকবর আলি, মীর্জা হুসেন আলি, মুন্সী বেলায়েত হোসেন, সৈয়দ জাফর খাঁ এবং হাছন রজা চৌধুরী। প্রথম কবির জন্ম সতেরো শতকের প্রথমার্ধে, শেষোক্ত কবির মৃত্যু বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে; সুতরাং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণপর্বে এইসব কবিদের কলমে গীতিকবিতাগুলি রচিত হয়েছিল যার সাংস্কৃতিক মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসব অসাম্প্রদায়িক কবিতা ও গান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জগদীশনারায়ণ সরকার একদা মন্তব্য করেছিলেন: 'এইগুলি বাঙ্গালী জাতির অখণ্ডতা ও মনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে বিশেষ সাহায্য করে।' এই অধ্যায়টি লেখকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, যেখানে তিনি শুধুমাত্র কবিদের জীবনীমূলক তথ্য যথাসাধ্য উদ্ধার করেন নি, সেই সঙ্গে সংগীতগুলিও উদ্ধার করেছেন এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাদটীকা-সমূহ লেখক স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন; তবে এর শিরোনাম হতে পারত 'প্রসঙ্গ ও সূত্রনির্দেশ' এবং তা আলাদা অধ্যায় কখনোই হতে পারে না। বস্তুত প্রথম অধ্যায়ের সূত্রনির্দেশ এবং টীকা প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের উৎসনির্দেশ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যুক্ত করলেই রীতিসম্মত হত। 'অভিমত' হিসেবে অধ্যাপক আহমদ শরীফের লেখা ব্যক্তিগত চিঠি বইতে যুক্ত করবারও কোনো কারণ নেই। পরিশিষ্টগুলির মধ্যে গানগুলির প্রথম ছত্রের সূচী, কাজী নজরুল ইসলাম রচিত শ্যামাসংগীতসমূহের বর্ণানুক্রমিক প্রথম ছত্রের সূচী, মীর্জা হুসেন আলি সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য "চুনটাপ্রকাশ" পত্রিকার প্রবন্ধ, হাছন রজার "হাছনউদাস" বইয়ের প্রথম সংস্করণের ফ্যাকসিমিলি দেওয়ায় গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কোনো রীতিতেই প্রতিকৃতি ছাপা পরিশিষ্ট হতে পারে না। আসলে লেখক যতখানি সৎ, সরল এবং তথ্যনিষ্ঠ ততখানি পেশাদার গবেষক নন; ফলে পদ্ধতিগত বা মেথডলজিক্যাল নানা দোষ আছে। তা ছাড়া মুদ্রণ-প্রকাশন সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি উৎকৃষ্ট বইটির অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। তবু সব মিলে এই কাজ সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

মুসলমান কবির শ্যামাসংগীত বিষয়ে কয়েকটি কথা খোলামনে বিচার করা দরকার। ইতিহাসবিদ ড. তারাচাঁদ থেকে সাহিত্যরসবেত্তা পণ্ডিত আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ অনেক লেখকই যুক্তি-তথ্য দিয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা তথা সংস্কৃতির ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার প্রোজ্জ্বল দিক হিসেবে যৌথ সাধনা এবং সমন্বয়বাদী ধারাগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন। তবু বিরোধী মৌলবাদী এবং রক্ষণশীল লেখকদের অপপ্রচার এবং ইতিহাসবিকৃতি অব্যাহত থাকার ফলে কিছু ভ্রান্ত ধারণা এখনো বদ্ধমূল থেকে গেছে। স্বতন্ত্রভাবে বাঙলা ও বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলামের সমন্বয়বাদী ভূমিকা সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। বহু তথ্য প্রামাণিক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ্যে কম পরিচিত নয় কি? মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য প্রধানত ধর্মাশ্রিত, এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক সাহিত্য তার পাশাপাশি যতখানি সৃষ্টি হয়েছে, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব বাঙালি মুসলমানদের, বাঙালি হিন্দুদের নয়। হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যসেবীদের আলাদা সাম্প্রদায়িক বিভাজন আমার বলার উদ্দেশ্য তো নয়ই, বরং বলতে চাইছি উলটো। অস্বীকার করার উপায় নেই—ইসলামীয় ধর্ম, শাস্ত্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরবি-ফারসি সাহিত্যের সংস্পর্শ এক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যকে সজীব করেছে। দ্বিতীয়ত, এ কথাও অবিসংবাদিত ইতিহাসসম্মত সত্য বাঙালি হিন্দু কবি সাধারণভাবে ইসলামীয় শাস্ত্র, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে উদাসীন। কিছু ব্যতিক্রম আছে তবে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এখানে নেই, প্রয়োজনও নেই। যেটা জোর দিয়ে

বলা দরকার, তা হল তুলনামূলকভাবে বাঙালি মুসলমান কবিদের অনেকেই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে হিন্দুধর্মাশ্রিত সাহিত্য রচনা করে বঙ্গসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন অনেক বেশি। শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি অবস্থান—একই সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে—দুই সম্প্রদায়কে একে অপরের জানা-চেনার সুযোগ করে দিয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ সে সুযোগ তেমন না নিলেও, সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানগণ তা বেশি করে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক হিন্দু মানসে তা স্বীকৃত না হলেও, ধর্মনিরপেক্ষ মানসে তা ধরা পড়ে। তৃতীয়ত, তেমনি সাম্প্রদায়িক মুসলিম মানস ইসলামের রূপ পৃথিবীতে সর্বত্র এক ও অখণ্ড বলে যতই বিশ্বস্ত থাক, ইতিহাসে দেখি পরিবেশ ধর্মকে প্রভাবিত করেই, যেমন করে সামাজিক অনুশীলন। নইলে শরিয়তি নিষ্ঠার পাশাপাশি মারফতি ফকির-দরবেশদের মানবতাবাদী জনমুখী প্রেমধর্ম ছড়িয়ে পড়ল কী করে? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু সাহিত্যের কথাই এখানে তুলছি। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ একবার লিখেছিলেন: 'কাফের বিদ্বেষী মুসলমানগণ হিন্দুদের দেবদেবীকে পর্যন্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব কবিগণ। ইহা ছাড়া মুসলমান সাহিত্যসেবীরা হিন্দুদের বিষয়কে তাঁহাদের কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় করিতে কোথাও দ্বিধা করেন নাই। আমরা ব্রজসুন্দর সান্যাল, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, আহমদ শরীফ প্রমুখ গবেষকদের রচনার মাধ্যমে মুসলমান কবিদের সম্পর্কে জানি। অমিয়শঙ্কর চৌধুরী মুসলমান শাক্তভাবাপন্ন কবিদের বিষয়ে আলোচনা করে সেই ধারাই পুষ্ট করলেন বলে এত কথা বলার প্রয়োজন হল।

"মুসলিম কবির শ্যামাসঙ্গীত" প্রসঙ্গে লেখকের আলোচনায় অবশ্য কিছু-কিছু বক্তব্য সংশোধন করা দরকার। একথা ঠিক পৌত্তলিকতা, বহুদেববাদ, বৈরাগ্য ও মোক্ষলাভ যেখানে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, পারলৌকিক ব্যাপারে জোর যেখানে বেশি, সেক্ষেত্রে ইসলাম একেশ্বরবাদী, অপৌত্তলিক, সর্বাংশে অদ্বৈতবাদী এবং ইহলৌকিক। আল্লাহ বা ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আত্মগত্য বা সাবমিশন থেকেই ইসলাম। তবে সপ্তম শতক থেকে অদ্যাবধি ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস, নানা দেশে তার আঞ্চলিক ইতিহাস ইত্যাদি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে মরমিয়াবাদও ইসলামে ছিল। লেখক এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন নি। নিকলসনের বিখ্যাত বই তো হাতের সামনেই ছিল। ভারতে আলোচনা প্রসঙ্গে সুফীবাদ এবং বাঙলায় পীরবাদ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি ছিল। পঞ্চধর্মকৃত্য হবে নামাজ, রোজা, কলমা, জাকাত আর হজ। 'রিলিজিয়ন ওরিয়েনটেড চিন্তাধারা' শুধু হিন্দুদের কেন হবে? গোঁড়ামি-মুক্ত চিন্তা তাদের মধ্যে ছিল না? শুধু ভারতের প্রেক্ষিতেই, এককথায়, ইসলামে সামাজিক রীতি ও আচরণে ঔদার্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বেশি, ধর্মের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা প্রবল; অপরপক্ষে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মে ঔদার্য বেশি কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা প্রবল। রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ক'রে একথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান যুক্ত-সাধনায় অগ্রণী ছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। বাঙলার ইসলামের সমন্বয়বাদী ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখক ইতিহাসবিদ অসীম রায়ের সুন্দর গবেষণার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। আধুনিক যুগে ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়বাদের ক্ষয়িষ্ণুতার কারণও আলোচনা করলে পাঠকদের সুবিধে হত।

নওয়াজিস খান, আলি রজা, আকবর আলি, মীর্জা হুসেন আলি, মুনসী বেলায়েত হোসেন, সৈয়দ জাফর খাঁ, হাছন রজা চৌধুরী প্রমুখ কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনায় লেখক স্বচ্ছন্দ। তাঁর বিশ্লেষণ উপভোগ্য ও উচ্চাঙ্গের। লেখক অবশ্য আরো বেশি তথ্য পাননি বলে খেদ করেছেন কিন্তু আমরা পরিতৃপ্ত। অমিয়শঙ্কর চৌধুরীর রচনার বড়ো বৈশিষ্ট্য ভাষার

সারল্য, সহজ অকপট স্বীকারোক্তি, উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনের পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গ্রন্থের মূল্য আশাতীত কম। বর্তমানে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যখন রাজনৈতিক সার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কিছু ব্যক্তি ও দল ব্যবহার করতে চাইছেন, এমনকী ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েও, সেই সময় বর্তমান গ্রন্থটি উজ্জ্বল দিশারি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য।

প্রসঙ্গ : টি. এস. এলিঅট এবং বিষ্ণু দে

সুজিৎ ঘোষ

বিষ্ণু দের আশিতম জন্মবার্ষিকীতে বর্তমান আলোচকের সম্পাদনায় "এবং এই সময়" পত্রিকার বিষ্ণু দে স্মরণ-সংখ্যা প্রকাশিত হয়। একই বছর বিনয়কুমার মাহাতার গ্রন্থ ও চলতি বছরে ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিষ্ণু দে বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হল। বাঙলায় বিষ্ণু দে-চর্চা যে বাড়ছে, এ তারই প্রমাণ। রবীন্দ্রপরবর্তী বাঙলা কবিতার আলোচনায় বিষ্ণু দের নামের সঙ্গেই বিশেষভাবে এলিঅটের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

আমেরিকা থেকে ইংল্যানডে এসে এলিঅট ইংরেজি কাব্যের পালাবদল ঘটিয়েছিলেন। নিজের কাব্যপ্রতিভা ছাড়াও "ক্রাইটেরিয়ান" পত্রিকার সম্পাদনায় সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এলিঅটের (১৮৮৮-১৯৬৫) জন্মশতবার্ষিকী অতিক্রান্ত হয়েছে তিন বছর আগে এবং বিষ্ণু দের (১৯০৯-৮২) আশি বছর পূর্ণ হয়েছে ১৯৮৯ সালে।

লক্ষণীয় এই যে, জীবৎকালে একটি পরিশীলিত শিক্ষিত শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বিষ্ণু দে আদৃত হলেও সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। বরং দুর্বোধ্যতার অভিযোগ বিষ্ণু দের কাব্য সম্পর্কে বারেবারেই শোনা গেছে। দুর্বোধ্যতা ছাড়াও, তাঁকে বাঙালি কাব্যপাঠকের অনেকেই গজদন্তমিনারবাসী বলে মনে করেছেন। ইংরেজি কাব্যপাঠকও সাধারণভাবে চল্লিশের দশকে এলিঅটকেও গজদন্তমিনারবাসী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, সমাজ-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত সংবেদনের গীতিকবি হিসেবে বিচার করেছেন। কিন্তু, কাব্যবিচারে এলিঅটের সাফল্যের যে মূল্যায়নই করা হোক না কেন, উপরিউক্ত ধারণার বিপরীতটি বরং সত্য। এলিঅটের মতো বিষ্ণু দেও তাঁর প্রবণতায় সামাজিক মানুষ, নিজের কালের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। এলিঅটের 'দেশ'-চেতনায় শুধু ইউরোপের অস্তিত্ব। কিন্তু, বিষ্ণু দের 'দেশচেতনা' স্বদেশ ও বিশ্ব নিয়ে ব্যাপ্ত। অ্যাংলো-ক্যাথলিক রাজতন্ত্রী বলে এলিঅট নিজেকে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও তাঁর ঝোঁক স্পষ্টতই গণতন্ত্রের প্রতি। "ক্রাইটেরিয়ান" পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এলিঅটের ভূমিকার যে বিবরণ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এ. এল. মর্টন রেখে গেছেন, সে বিবরণেও এলিঅটের এই গণতান্ত্রিক প্রবণতার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রমাণ রয়েছে। বিষ্ণু দের প্রথম চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সামনে রেখে "সাহিত্যপত্র" পত্রিকাটি চালিয়েছেন। "সাহিত্যপত্রে"র সংখ্যাগুলিতে বিষ্ণু দেরও এই গণতান্ত্রিক ঝোঁক প্রমাণিত। যদিও সাম্যবাদে তাঁর বিশ্বাস, কিন্তু সেই সময়ের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো পার্টি-লাইনের দৃঢ় অনুসারী বিষ্ণু দে নন।

একথা সকলের জানা যে, বদল্যার, লাফর্গ, র‍্যাঁবো প্রভৃতি ফরাসি কবিদের কাব্য এলিঅটকে

এলিয়ট বিষ্ণু দে ও আধুনিক বাংলা কবিতা—ড. বিনয়কুমার মাহাতা, দে বুক স্টোর্স, কলিকাতা-৭২, পঁচাত্তর টাকা। **বিষ্ণু দে: জীবন ও সাহিত্য**—ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, একশ পঞ্চাশ টাকা।

বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফরাসি প্রভাব তাঁর ওপর এতই তীব্র ছিল যে এলিঅট ফরাসি ভাষায়ও কিছু কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু, এলিঅটের কাব্যের প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টি-সম্ভারেই তিনি পাঠকের কাছে স্বীকৃতি পান। এলিঅটের কবিতা-রচনার কাল ১৯১৭ থেকে ১৯৪২–অর্থাৎ পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরে সৃষ্ট কাব্যসমগ্রকে স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যাবে—যে দুটি ভাগের মধ্যে গুণগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্য যেমন এলিঅটের মানস-ভাবনায়, তেমন কাব্যপ্রকরণেও ধরা পড়ে।

বিষ্ণু দের "চোরাবালি" (১৯৩৭) তাঁর প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থ, এবং পরিণত পর্বের "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" (১৯৫৩) বা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থের পাশেও "চোরাবালি"র দ্যুতি ম্লান হয় না। কিন্তু, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এলিঅটের মধ্যে নীতিবাদের ঝোঁক বৃদ্ধি পেয়েছে। সে নীতিবাদ এলিঅটের কাব্যকে সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে ক্ষতি করেছে বলে কোনো-কোনো সমালোচক মনে করেছেন। কিন্তু বিষ্ণু দের ক্ষেত্রে সাম্যবাদের প্রতি আনুগত্য তাঁর কাব্যের ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে কোনো নীতিবাগীশ বক্তব্য-প্রাধান্য নিয়ে আসে নি।

এলিঅট এবং এজরা পাউনড সমকালীন ইংরেজি কবিতাকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করলেন। ইয়েটসের কাব্যেও আঞ্চলিকতা একটি বড়ো স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক বাঙলা কবিতায় জীবনানন্দের কাব্যেও আঞ্চলিকতার এক গভীর অস্ত্যর্থক প্রতিপত্তি দুর্লক্ষ্য নয়। পাউনড বা এলিঅটের কবিতায় আঞ্চলিকতার পরিবর্তে এল বিশ্বজনীন নাগরিকতা। স্বভাবতই পাউনড-এলিঅটের এই বিশ্বজনীন (কসমোপলিটান) নাগরিকতার মূল নিহিত মার্কিনদেশে, তাঁদের জন্মসূত্রে। এলিয়ট ঐতিহ্যের সন্ধানে আমেরিকা ত্যাগ করে ইংল্যানডের নাগরিক হয়েছিলেন, কিন্তু সেই নাগরিকত্ব এলিঅটকে ইংল্যানডের কোনো বিশেষ অঞ্চলের লোকবিশ্বাস-লোকশ্রুতি-নিয়ম-আচার-জলবায়ুর অচেতন সহস্র বন্ধনে জড়িত করে নি। বাঙলা কাব্যে বিষ্ণু দের কবিতাও আঞ্চলিক-প্রভাবমুক্ত। পাঁতিহালে একটি 'দেশের বাড়ি'র অস্তিত্ব থাকলেও বিষ্ণু দের কাব্যে সেই গ্রামের বা বিশেষ অঞ্চলের জন্যে কোনো নস্টালজিয়া প্রতিফলিত হয় নি। উত্তর-সাতচল্লিশে কলকাতা ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। তবু লনডন-প্যারিসের মতো মেট্রোপলিসের সঙ্গে তখনও কলকাতার তুলনা চলত না—বিশেষ করে বিষ্ণু দের বাসস্থান পুকুর-ডোবা-জঙ্গলে ভরা সে যুগের দক্ষিণ-কলকাতায়। তাই বিষ্ণু দে যখন স্বদেশ ও বিশ্বকে গ্রথিত করেছেন স্বীয় চৈতন্যে, তখন সে গ্রন্থনায় সূত্র হিসেবে কাজ করেছে সাম্যবাদী ভাবাদর্শ। ফলে, বিষ্ণু দের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর মতো ব্যক্তিক বিশ্বজনীনতা নয়, মানবিক যূথচেতনার আন্তর্জাতিকতা ক্রমশ বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এই মানবিক যূথচেতনার পূর্বাপর অনুসন্ধানেই বিষ্ণু দে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কালচেতনায় উপনীত হয়েছেন, ত্যাগ করেছেন 'প্রাক্তন পাশ্চাত্য মাগি না, মন তুষার'-এর মতো সংহত কাব্যপংক্তির হতাশা-বোধ।

এলিঅটের প্রথম পর্বের কবিতার মূল সুর অবসাদ, হতাশাবোধ, আত্মসংশয়, অতৃপ্তি। কিন্তু এই ধরনের নেতিবাচক আবেগগুলিও কবির অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞার বৃত্তে কেলাসিত, সে কারণে এই পর্বের কাব্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

বিষ্ণু দের "চোরাবলি" এবং "উর্বশী ও আর্টেমিস" (১৯৩৩) পর্বের কবিতায় ("উর্বশী ও আর্টেমিস" প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, কিন্তু "চোরাবালি"র বেশ কিছু কবিতা "উর্বশী ও আর্টেমিসে"র আগে রচিত) এলিঅটের মতো হতাশাবোধ, প্রেমে অবিশ্বাস, আত্মসংশয়, অতৃপ্তি ইত্যাদি আধুনিক-কবিসুলভ লক্ষণ চোখে পড়বে। কিন্তু উক্ত অনুভবগুলি যতটা সমকালীন চলতি রীতির, ততটা উপলব্ধিজাত নয় বলে মনে হয়। বিষ্ণু দে যখন বাঙলা কাব্যে স্বপ্রতিষ্ঠ হচ্ছেন, এলিয়ট তখন তাঁর কাব্য-রচনার অস্তপর্বে উপনীত। এলিঅটের "বার্নট নর্টন" প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। "বার্নট নর্টন"-সহ "ফোর কোয়ার্টেট্স্"-এর অন্য তিনটি কবিতাতেও যে উষরতার আবহাওয়া, ক্লান্তিবোধের দীর্ঘনিশ্বাস অনুভব করা যায়, তা "ফোর কোয়ার্টেট্স্" অন্তর্গত কাব্যবস্তু নয়। বরং যে নৈতিক দার্শনিকতার প্রেরণা এই কবিতা-গুলির উৎস বলা চলে, অনিচ্ছাকৃত কবিকল্পনাকে সেই প্রেরণা বশীভূত করতে পারে নি বলেই "ফোর কোয়ার্টেট্স্"-এ আশ্চর্য সুন্দর কিছু কাব্যপংক্তিও সৃষ্টি করেছে। এই দ্বিতীয় পর্ব, প্রকৃত পক্ষে এলিঅটের "কোরাসেস ফ্রম 'দ্য রক'" (১৯৩৪) থেকে শুরু। এই পর্বে এলিঅট নৈতিক আদর্শকে কাব্যিক অভিজ্ঞতার বাহন করতে চেয়েছেন, তাঁর মনে শিল্পের স্থান দখল করেছে নৈতিকতা—যা কাব্যিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। কেন না, নৈতিকতার কাব্যের নান্দনিক শর্ত পূরণের কোনো দায় নেই।

তুলনায়, আলোচ্য ক্ষেত্রে বিষ্ণু দের বিকাশ এলিঅটের চেয়ে অস্ত্যর্থক। আগেই বলা হয়েছে, কবি হিসাবে বিষ্ণু দের সূচনাপর্বে এলিঅটের কাব্যে ক্ষয় ফুটে উঠেছে। এলিঅটের তুলনায় বিষ্ণু দের সক্রিয় কাব্যজীবনও দীর্ঘ (১৯৩৩ থেকে ১৯৮১) —"উর্বশী ও আর্টেমিস" থেকে "আমার হৃদয়ে বাঁচো" গ্রন্থ প্রকাশ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীর কালপর্বে, কাব্যিক সৌন্দর্যতত্ত্বের শর্ত উপেক্ষা করে কোনো নৈতিক-রাজনৈতিক আদর্শবাদ বা তত্ত্বকে বিষ্ণু দে সৌন্দর্যতত্ত্বের পরিবর্ত হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ১৯৪০-এ বুদ্ধদেব বসু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "পদাতিকে"র আলোচনায় লিখেছিলেন, 'হয় তাঁকে কর্মী হতে হবে, নয়তো কবি। তিনি কোন্ দিক ছাড়বেন' ("কালের পুতুল", পৃ ৯১)? সাম্যবাদী কাব্যধারার বরিষ্ঠ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ প্রশ্ন বিষ্ণু দের সামনে রাখার সুযোগ ছিল না, কেন না কবি হিসাবে কবিতার শর্ত পূরণের প্রয়াসে বিষ্ণু দে পূর্বাপর দ্বিধাহীন, নিঃসংশয়। কিন্তু, কোনো যথার্থ শিল্পীই একটি স্থিরবিন্দুতে স্থিত নন। চলিষ্ণু সময়-সমাজ কবির অভিজ্ঞতায় আনে নতুন আবহ, প্রয়োজন হয়ে পড়ে সে অভিজ্ঞতা প্রকাশের নতুন আঙ্গিক আর প্রকরণের। পশ্চিমের নাগরিক-জগতে শিল্প-সভ্যতা-জাত অনিশ্চয়তা ও আত্মিক অবসাদ এলিঅটের প্রথম যুগের কবিতায় যথাযথ প্রকাশিত। পশ্চিমী সমাজ-সময়ের গতির হার এদেশের তুলনায় অনেক দ্রুত। সে কারণে বিষ্ণু দের অভিজ্ঞতার বিবর্তন এলিঅটের তুলনায় ধীরলয়ে প্রাপ্ত 'বর্তমানে'র অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যও সীমিত। সেই অভিজ্ঞতার-উপলব্ধির সীমা প্রসারিত করার প্রয়াসে বিষ্ণু দের অধ্যয়নের ক্রমপ্রসারমান জগৎ, সে জগৎ স্বদেশের ও বিশ্বের সকল ইতিবাচক ঐতিহ্যের মাধুকরীতে বিষ্ণু দে পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন।

ঐতিহ্যের প্রশ্নেও এলিঅটের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরও অনেক শিল্পীর মতো বিষ্ণু দের অভিজ্ঞতারও পার্থক্য দুস্তর। এলিঅটের মতে ঐতিহ্য জন্মসূত্রে লভ্য নয়, তা বহু পরিশ্রমে পেতে হয়। ('Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited and if you want it you must obtain it by great labour.' *The Sacred Wood*, p 49) ঐতিহ্য যে কঠোর মানস শ্রমের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব—এলিঅটের এ-বক্তব্যের সঙ্গে ইয়েটস ও বিষ্ণু দের উক্তি-উপলব্ধির সাদৃশ্য লক্ষ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐতিহ্য যে পরম্পরাগত নয় (cannot be inherited),—এই বক্তব্যকে এলিঅট কার্যত প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত (first postulate) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত স্থিরীকৃত করার ক্ষেত্রেই এলিঅটের সঙ্গে ইয়েটস-সহ আধুনিক ঐতিহ্যপন্থী সাহিত্যিকদের অবস্থানের

ক্য চিহ্নিত।

ঐতিহ্য কোনো মূল্য-নিরপেক্ষ (value-neutral) ধারণা নয়। প্রকৃতপক্ষে, কোন্ অবস্থায়, কখন, কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও আত্মীকরণ চলছে, তার ওপরেই নির্ভর করে ঐতিহ্যের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিচার। সমাজের জীবন্ত ধারায় ঐতিহ্য এবং প্রগতির ক্রমাগত বিরোধ চলতে থাকে। এ যেন বংশগতি এবং অভিযোজনের মতো। তাই ঐতিহ্য এবং প্রগতির বিবর্তনে ইতিবাচক আর নেতিবাচক শ্রেণীবিভাগ (categories) নিরপেক্ষভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঐতিহ্যকে ইতিবাচক, রক্ষণশীল দিক হিসেবে দেখা চলে, প্রগতিকে বলা যায় নেতিবাচক —তা ঐতিহ্যাগত সবকিছুকে ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছে। আবার, প্রগতিকে সৃজনশীল, সক্রিয়, ইতিবাচক ক্রিয়া হিসেবে দেখা চলে। কোনো ক্ষেত্রে ঐতিহ্য প্রতিবন্ধক, নিষ্ক্রিয়, নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বর্তমানের অবস্থার নেতিতেই (negation) যেমন ইতিহাসে প্রগতির পথচলা, সেক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রগতিকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে ভাবা যেতেই পারে। এলিঅটের ঐতিহ্যসন্ধানের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত ইউরোপের শ্বেতকায় উপনিবেশবাদ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় হত্যাতাণ্ডব চালিয়ে ভূমিপুত্রদের কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ওই তিন মহাদেশে ইউরোপীয়-বংশোদ্ভূত মানবগোষ্ঠীর খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসজাত ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল রয়ে গেছে ইউরোপে। ফলে, ইউরোপের বা এশীয় দেশগুলির দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে প্রতিতুলনায়, আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্য এখনও দৃঢ়মূল-শাখাপ্রশাখায় গড়ে ওঠে নি। ফলে পাউনড ও এলিঅটের মতো সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের ঐতিহ্যের খোঁজে আমেরিকার সীমানায় অতৃপ্ত হতে হয়। এবং এই অতৃপ্তিবোধেই এলিঅট স্বীয় জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে মনে করতে পারেন নি। এবং ইউরোপীয় ঐতিহ্যের শ্রমসাধ্য স্বীকরণের যুক্তি-পরম্পরায় এলিঅট উপনীত হন ক্যাথলিক অর্থডক্সি-তে। সাহিত্যরূপে এই অন্বেষাই রূপ পায় নিও-ক্লাসিসিজমে। দ্বিতীয়ত, এলিঅটের এই ভাবনাধারার সমর্থন ছিল হিউমের (Hulme) বক্তব্যে। সাহিত্যে দুই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে হিউম বললেন,

One, that man is intrinsically good, spoilt by circumstance, and the other that he is intrinsically limited, but disciplined by order and tradition to something fairly decent. To the one party man's nature is like a well, to the other like a bucket. The view which regards man as a well, a reservoir full of possiblities, I call the romantic, the one which regards him as a very finite and fixed creature, I call the classic. (T. E. Hulme : *Speculations*, p 117)

হিউমের সমগ্র বইটির বক্তব্য-মুক্তির পারম্পর্যহীনতা সম্পর্কে রবার্টস আলোচনা করেছেন (Michael Roberts : *Critique of Poetry*, p 170-181)। কিন্তু এলিঅট প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হল, হিউম শৃঙ্খলা ও ঐতিহ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যের সঙ্গেই ক্ল্যাসিসিজমের সমীকরণ করেছেন। এলিয়ট ও হিউমের এই সমীকরণকে স্বীয় ভাবনার সমর্থনে গ্রহণ করেছেন।

বিষ্ণু দে স্বদেশের জলবায়ুতে ঐতিহ্যকে প্রায় বংশগতির মতোই লাভ করেছিলেন। আধুনিকতার প্রকরণ বিষয়ে বিষ্ণু দেও সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, কিন্তু ঐতিহ্য-প্রগতি, ক্লাসিসিজম-রোমানটিসিজমের চিরন্তন বিরোধের মীমাংসা বিষ্ণু দের কাছে ভিন্ন—জন্মসূত্রে এক ঔপনিবেশিক দেশের মানুষ হওয়ার ফলে উপনিবেশবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে স্বদেশী ঐতিহ্যের এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা রয়েছে। বিষ্ণু দের সমগ্র সৃষ্টিকর্মে ঐতিহ্যের এই ভূমিকা ক্রিয়াশীল। ভারতীয় লোক-উপাদান ও ধ্রুপদী সংস্কৃতির থেকে আহরিত বিষয়গুলি বারে-বারে তাঁর কাব্যে এসেছে। আবার, ঐতিহ্যের রক্ষণশীলতার মধ্যে থাকে চোরাবালি। মার্কসবাদের আশ্রয় বিষ্ণু দেকে সেই চোরাবালি থেকে মুক্ত করেছে, ফলে বিষ্ণু দের কাছে ঐতিহ্য একই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, বিপুলপ্রসারী সর্বমানবিক। কিন্তু এলিঅটের কাছে ক্যাথলিক ধর্ম গোঁড়ামি নিয়ে এসেছে ; কাব্য ও ধর্মের প্রকাশের, প্রয়োজনের ও রূপের প্রভেদ এলিঅটের শেষ পর্যায়ের রচনায় প্রায় লুপ্ত। কিন্তু মার্কসবাদের দর্শনপ্রচার ও কাব্যসৃষ্টিকে বিষ্ণু দে সমার্থক মনে করেন নি। ফলে, বিষ্ণু দের পরিণত বয়সের কবিতাও দর্শন-তত্ত্বের বক্তব্যের আধারমাত্র নয়। কিন্তু, সমুন্নত ভাব অবলম্বন করেই কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু দে মূলত সময়-পরীক্ষিত দুটি সমুন্নত ভাবকে তাঁর কাব্যের অবলম্বন করেছেন—স্বদেশপ্রেম এবং নারীর প্রতি প্রেম। বিষ্ণু দের কাব্যে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দেশ ও নারী একাকার হয়ে গেছে। এখানে বরং লুই আরাগঁর "এলসা"র প্রতি কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে বিষ্ণু দের কাব্য-উপলব্ধির তুলনা করা চলে। কিন্তু নাৎসী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধের কালে অন্য বহু ফরাসি দেশপ্রেমিকের মতো আরাগঁও কবিতার সঙ্গে প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছেন। "এলসা" কবিতাগুচ্ছ আরাগঁর সেই বিশেষ পর্বের ফসল। এলসা আরাগঁর স্বকীয়া দয়িতা। বিষ্ণু দের প্রেম-কবিতার উদ্দিষ্টও স্বকীয়া দয়িতা—বাঙলা কাব্যের পরকীয়া প্রেমকবিতার দীর্ঘ ঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন বিষ্ণু দে। প্রেম সম্পর্কে বিশিষ্ট মানস প্রবণতা বিষ্ণু দের নিজস্ব। বিষ্ণু দের বিবাহ ১৯৩৫ সালে। সুতরাং আরাগঁর "এলসা" কাব্যগুচ্ছ বিষ্ণু দের কাছে বিশেষ আদরণীয় হতে পারে, কিন্তু সে কবিতা বিষ্ণু দেকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করার যুক্তি নেই।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে গদ্য প্রাবন্ধিক হিসেবেও এলিঅটের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যসমালোচনার আদর্শ হিসেবে তাঁর মূল লক্ষ্য নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonalism)। কা মনের অনুঘটকের ভূমিকা তাঁর কাম্য। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যের মতো দুটি পর্ব দেখা যাবে। এলিঅটের দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্য-সমালোচনায় শিল্পের সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য বাস্তবত স্বীকৃতি পায় নি, যে দৃষ্টিভঙ্গি মানবের সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যকেও কার্যত অস্বীকার করে।

সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে "বঙ্গদর্শনে"র বঙ্কিমের ভূমিকাও গ্রহণ করেন নি, এলিঅটের মতো বিশিষ্ট মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাও তাঁর লক্ষ্য নয়। তুলনামূলকভাবে বিষ্ণু দের গদ্যরচনার পরিমাণও খুব কম। অধ্যয়নকালে যে বিষয়-গ্রন্থ তাঁর ভালো লেগেছে সে বিষয়ে লিখেছেন কখনও পুস্তকসমালোচনার আকারে, কখনও প্রবন্ধের আকারে। বাঙলায় আধুনিক যুগে চিত্রশিল্পের সূচনা, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের গৌরব বাঙালির ছিল না। বিষ্ণু দে ব্যক্তিগতভাবে এবং বেশ কিছু গদ্যপ্রবন্ধে বাঙালি কৃষ্টির এই নবজাত ধারাটিকে সহায়তা দিয়েছেন, আধুনিক বাঙলা চিত্রকলার দর্শক সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস চালিয়েছেন তাঁর গদ্যরচনায়। এলিঅটের প্রতিভার অন্য একটি ক্ষেত্রের সঙ্গেও বিষ্ণু দের প্রতিভার মিল নেই। এলিঅটের কবিত্ব যখন অবসিত-প্রায় তখন তিনি কাব্যনাট্যের জগতে প্রবেশ করেছেন, ১৯৩৫-এ "মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল", ১৯৩৯-এ "দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন", ১৯৫০-এ "দ্য ককটেল পার্টি", ১৯৫৪-তে "দ্য কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক", ১৯৫৯-এ "দ্য এলডার স্টেটসম্যান" প্রকাশিত হয়। বিষ্ণু দে বিভিন্ন দীর্ঘ কবিতায় চমক, সংলাপ ইত্যাদি নাটকীয় প্রকরণের অল্পবিস্তর ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতো কাব্যনাট্য রচনার কোনো চেষ্টা তিনি করেন নি। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে নাট্যকার এলিঅটের ধারা পরিণত বুদ্ধদেব বসুর মধ্যেই লক্ষ করা যাবে। কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতা এলিঅট-প্রভাবিত নয়।

কবি হিসেবে এলিঅটের মূল্যায়ন চলতে থাকবে,

যেমন লেখা হয়েছে :

'As a poet he exhibits, with nervous sensitivity, a strong negative genius of restrain. As a critic he is sensitive and appreciative, prevaricative and niggling. As a thinker, while a certain quality of shrewdly pereeptive common sense pervades his work, he showed no profundity and no coherent analytical power whatever. An admirably disciplined use of creative power of the second order it is which has earned him his present deserved eminence'. (D. A. Savage, the Presonal Principle, *Studies in Modern Poetry*, p 111.)

অন্যদিকে মাইকেল রবার্টস-এর মতো কাব্যরসগ্রাহী মনে করেছেন যে ভবিষ্যতে সমাজবদল হয়ে এলিঅটের প্রফ্রুকের মতো বাস্তব লোক যদি না থাকে, পাঠকের কাছে তখন এ কবিতা বাস্তব থাকবে না।

'But the rhetorical merit of the poem remains : it has said some thing which could not be said in ordinary speech, and said it exactly, and people who are interested in effective expression will read it.' (Michael Roberts : *The Faber Book of Modern Verse*, p 5).

স্টিফেন স্পেনডারও তাঁর মূল্যায়নে বলেছেন :

'If Eliot had no great last period in his poety to correspond to that of Yeats, he at any rate knew when his greatest work was achieved, and did nothing in his later writing to spoil or debase it". (Stephen Spender : *Eliot*, p 242).

চল্লিশের দশকের শুরুতেই ইংরেজি কবিতার জগতে এলিঅটের দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়েও অডেন-গোষ্ঠীর কবিরা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেন। সিসিল ডে লিউইস, অডেন, স্টিফেন স্পেনডার, লুইস ম্যাকনিস, ডিলান টমাস প্রভৃতি কবিদের কাব্য প্রকাশিত হতে থাকে (Francis Scarfe : *Auden and After* দ্রষ্টব্য)। একই সঙ্গে কাব্য সমালোচনায় চলতে থাকে এলিঅটের মূল্যায়ন।

বিষ্ণু দের দ্বারা প্রভাবিত কোনো শক্তিশালী কবি বা কবিগোষ্ঠী বাঙলা সাহিত্যে তৈরি হয় নি। বরং জীবনানন্দের অনুসরণ, অনুকরণ ও প্রভাব জীবনানন্দ-পরবর্তী বাঙলা কবিতায় অনায়াসে লক্ষ করা যাবে। জীবনানন্দের ওপর বহুমুখী চর্চাও শুরু হয়ে গেছে গত দু দশকে।

বিষ্ণু দের আশি বৎসর পূর্তির পরে বিষ্ণু দে সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবার প্রয়াস চলছে। তার আগে অবশ্য বেগম আক্তার কামাল, অরুণ সেন প্রভৃতি আলোচকরা স্বতন্ত্রভাবে কিছু কাজ করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে পত্রপত্রিকায় কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।

বিষ্ণু দের আশিতম জন্মবার্ষিকীতে (১৯৮৯ সাল) প্রকাশিত হয় "এবং এই সময়" পত্রিকার বিষ্ণু দে স্মরণ সংখ্যা—বর্তমান আলোচকের সম্পাদিত বলে উক্ত প্রকাশনার গুণাগুণ সম্পর্কে মন্তব্যের অধিকারী নই। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-পবিত্র সরকারের সম্পাদনায় বিষ্ণু দের কবিতাসমগ্র-১ (১৯৮৯) ও কবিতাসমগ্র-২ (১৯৯০) প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় ড. বিনয়কুমার মাহাতার "এলিঅট বিষ্ণু দে ও আধুনিক বাংলা কবিতা"। বিনয়বাবুর এই গ্রন্থে তাঁর বিপুল শ্রমের পরিচয় রয়েছে। "এলিঅট বিষ্ণু দে" নামকরণ থাকলেও বিনয়বাবুর গ্রন্থটির আলোচনার পরিসর আরও বিস্তৃত—নয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থটির বিষয় ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি কবিদের কাব্যধারার এক সাধারণ পরিচয়ে তিনি উত্তর-রৈবিক বাঙলা কবিতার পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এলিঅটের কবিতার বাঙলা অনুবাদ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে ও হুমায়ুন কবির — এই চারজন বাঙালি কবির প্রয়াস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এলিঅটের "থ্ জার্নি অব থ্ ম্যাজাই" কবিতার রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদের তুলনা-

মূলক আলোচনা করেছেন, যে আলোচনা বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে। রবীন্দ্র-অনুবাদে "তীর্থযাত্রী" কবিতাটি যে রবীন্দ্রকাব্যধারায় "পুনশ্চ"র কবিতার সমপর্যায়ভুক্ত, বিনয়বাবুর এই বিচার যথার্থ বলে মনে করি। আলোচ্য কবিতার অনুবাদে বিষ্ণু দে অনেক মূলানুগ, বিনয়বাবুর আলোচনায় তা স্পষ্ট, কিন্তু বাঙালি পাঠকের কাছে কবিতা হিসেবে কার অনুবাদ বেশি গ্রহণীয়, তা বিনয়বাবু বলেন নি। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা আমরা জানি। বিষ্ণু দের "এলিঅটের কবিতা" কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে খুব আদৃত হয় নি, ইংরেজি-জানা পাঠক তো এলিয়ট পাঠ করেছেন সরাসরি ইংরেজি ভাষায়। হুমায়ুন কবিরের এলিঅট-অনুবাদটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিনয়বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙলা কবিতার আধুনিকতায় এলিঅটের অবদান সম্পর্কে আলোচনায় মূলত এলিঅট-কথিত আঙ্গিক ও প্রকরণ সম্পর্কিত 'আধুনিকতা'র নির্দেশগুলি অবলম্বন করে জীবনানন্দ এবং পরবর্তী কবিদের কাব্যে সেই নির্দেশিত লক্ষণগুলির প্রকাশ নিয়ে আলোচনা। একই সঙ্গে আধুনিক কাব্যে চিত্রকল্পের নানা রূপরীতির বিশ্লেষণ করে বিনয়বাবু চিত্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশকে নামসংজ্ঞাবদ্ধ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে এলিঅট ও বিষ্ণু দে আলোচ্য—স্বভাবতই এই অধ্যায় দীর্ঘতম, শতাধিকপৃষ্ঠাব্যাপী। উভয় কবির কাব্যের তুলনামূলক অনুপুঙ্খ আলোচনা বিনয়বাবু করেছেন। সে আলোচনার মূল্য রয়েছে, কিন্তু মূলত তা প্রকরণগত সাদৃশ্যের আলোচনা—এলিঅট ও বিষ্ণু দের কাব্যের চিদাত্মার (spirit) বৈসাদৃশ্য আলোচিত হয় নি। পঞ্চম অধ্যায়ে বুদ্ধদেব বসু ও অন্যান্যদের ওপর এলিঅটের অনুরূপ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা। এবং বুদ্ধদেবের প্রথম পর্বের কাব্যগুলিতে যে এলিঅটের প্রভাব দৃঢ় নয়, বিনয়বাবু সে কথা উল্লেখ করেছেন। সমর সেনেও এলিঅটের প্রভাব প্রকরণগত, আত্মিক-দার্শনিক নয়। আসলে রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বগ্রাসী প্রভাবের প্রতিরোধে বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছে এলিঅট এক বর্মের কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। অষ্টম অধ্যায়ে এলিঅট ও বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্য প্রসঙ্গ আলোচনাটি প্রয়োজনীয়, নতুন—বিনয়বাবু বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র, বিশদ আলোচনা করলে ভালো হয়। গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে উল্লেখপঞ্জীর রীতি ত্রুটিপূর্ণ। বিনয়বাবুর গ্রন্থটি বহু পাঠক পড়বেন ও আলোচিত হবে, আশা রাখি।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৯১-এ প্রকাশিত হল "বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য"। চল্লিশটি নতুন ও পুরাতন প্রবন্ধের সংকলনে বিষ্ণু দের কাব্যের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। শঙ্খ ঘোষ, দেবেশ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আলোক, সরকার অসীম রায় প্রমুখ অনেক লেখকের প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ। কিন্তু নানা স্থানে ছড়ানো লেখাগুলি এখানে একত্রে পাওয়া গেল। সুমিতা চক্রবর্তী, রবিন পাল, দেবদাস জোয়ারদার, তরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখর প্রবন্ধগুলি নতুন। শীতল চৌধুরী, সুজিত সেন প্রমুখ নবীন প্রবন্ধকারদের রচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অধ্যাপক মৃণালকান্তি ভদ্রের প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। উদয়কুমার চক্রবর্তী বিষ্ণু দের কবিতার ভাষা নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করেছেন। তবে, এ ধরনের প্রবন্ধ-সংগ্রহের একটি অসুবিধা যে, প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাবনা ও প্রকাশের কোনো অন্তর্গত ঐক্য থাকে না, যদিও কবি বিষ্ণু দে-ই সকলের আলোচ্য। কবির নানা দিক আলোচিত হওয়ায় ছাত্রদেরও কাজে লাগবে। প্রভাতকুমার দাসের বিষ্ণু দের জীবনপঞ্জী সুলিখিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ১৯৮৩ সালের "প্রসঙ্গ : বিষ্ণু দে" প্রকাশনায় "বিষ্ণু দের গ্রন্থপঞ্জী" মনে হয় এ-গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী থেকে ভালো হয়েছিল। সন্দীপ দত্তর "বিষ্ণু দে-চর্চা : নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী" লেখাটি যুক্ত করে সম্পাদক ধন্যবাদার্হ।

সন্দীপ যেহেতু 'নির্বাচিত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেকারণে কিছু প্রবন্ধ বাদ পড়েছে (যেমন, রূপান্তরের পথে ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার "বিষ্ণু দে : উক্তি ও উপলব্ধি" প্রবন্ধটি), কিন্তু নির্বাচন করতে গেলে কিছু বাদ পড়বেই। তবে, সন্দীপের লেখাটি পরবর্তী বিষ্ণু দে-গবেষকদের কাছে এক অমূল্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

বাংলাদেশ থেকে

বাঙালির পলিটিকস

আশরাফ শামীম

'বাঙলার সচেতন মানুষকে ধোঁকা দেয়া যায় না', 'এদেশের জনগণ কখনো ভুল করে না', 'জনসাধারণের অধিকার আদায়ের জন্যই আমাদের রাজনীতি' : এসব গতবাঁধা কথা বাংলাদেশের পলিটিশিয়ান গোষ্ঠীর মুখে যত বারই শুনি, তত বারই আমার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সাথে পরিচিত পাঠকমাত্রেই জানেন "কমলাকান্তের দপ্তর" নামে যে সিরিজ-রচনা তিনি লিখে রেখে গেছেন, তা সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে কী অমূল্য সম্পদ। অন্যান্য আরো লেখা ছাড়া কেবল এই দপ্তরের মাধ্যমে বাঙালিকে যেভাবে তিনি শাসন করেছেন, বাঙালি সমাজের দুর্বলতাগুলোকে, বৈষম্যগুলোকে তুলে ধরে জাতির পৃষ্ঠদেশে তীব্র ব্যঙ্গাঘাত হেনেছেন, তাতে বোধকরি হিমালয়ের শুভ্র মুখমণ্ডলও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতে পারত, এবং পাষাণ বিদীর্ণ হত। কিন্তু বাঙালি? কে বলে এরা কোমলহৃদয়? গত একশো বছর ধরে এই বিপুল আঘাত দিব্বি হজম করে অন্তত একদল লোক প্রমাণ করে ছেড়েছে, বাঙালি কোমলস্বভাব ভীরু জাতি নয়। বরং পাষাণাধিক কঠিন এদের অন্তরপ্রদেশ। বাঙালির জন্য এই গৌরব ছিনিয়ে আনায় যদি কারো একক কৃতিত্ব থেকে থাকে, তবে বিবাদ অনাবশ্যক। কলহ-প্রিয় এই জাতি নিদেনপক্ষে এই প্রশ্নে সব বিবাদ ভুলে একবাক্যে রায় দেবে—এই সাফল্যের হকদার এদেশের পলিটিশিয়ান গোষ্ঠী। দু-একটি মহৎ ব্যতিক্রম ছাড়া হাজার বছর ধরে এই বঙ্গদেশের উর্বর জমিতে শত ফুল ফুটলেও বঙ্গ-পলিটিশিয়ানের অন্তরে পৌঁছে নি এর সৌরভ, রূপ-রস-বর্ণ। এই মাটির ঘ্রাণ তার কঠিন হৃদয়-প্রাচীরে বাধা পেয়ে ফিরে গেছে পরভূমে, পরহৃদয়ে। রোগ-শোক-দারিদ্র্যলাঞ্ছিত ব্যথাতুর বঙ্গজনের মুখগুলোকে এরা ভুলে থেকেছে, চাটুবাক্যের মায়াজাল বিস্তার করে সম্মোহিত করে রেখেছে এই চিরসবুজ দেশটির চির-সরল মানবসন্তানদের। পরিণতি? যোজনব্যাপী হতাশা, নীরন্ধ্র অন্ধকার আর শোষণের লেলিহান অগ্নিবর্ম আজ কী অলৌকিক উপায়েই না আবৃত করেছে একটি জাতিকে, বিচ্ছিন্ন করেছে বাইরের মুক্ত পৃথিবী থেকে। বাঙালি পাষাণ নয় তো কী?

তাই, বাঙালির পলিটিকস কী বস্তু এবং বাঙালি পলিটিশিয়ান কারা, সে পরিচয় তুলে ধরার জন্য আমাদের এই আয়োজন। একটু পেছনে তাকানো যাক; দেখব, এক সময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার "বাঙালি বাবু-কাহিনী" শাসক ইংরেজের নৈশ-পানোৎসবে বেশ একটা হাস্য-কলরব ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের খোরাক ছিল। ইংরেজের তাঁবেদার ভারতীয় বাঙালি "বাবু" প্রভুর অনুকরণে কেমন ইংরেজি বোল ছাড়ত, সোমরসকে সভ্যতা বিবেচনা করে এর মাঝে বিলীন হবার কসরত করত তার পরিচয় সেকালের বহু লেখায়, কবিতা-প্রহসনে, নাটক-উপন্যাসে মিলবে। সেই ধুতি-লুঙ্গি ছেড়ে কোট-প্যানট-পরা, জনসম্মুখে বিবির মুখচুম্বনে উন্নত সংস্কৃতির স্বাদ পাওয়া পুরনো বাবুর যুগ পেরিয়েছে অনেক কাল আগেই। সেই লালমুখো সাহেবের দলও মসনদ ছেড়ে পালিয়েছে। এরপর আমাদের পর্বতবাসী স্বধর্মী

ভাইরাও চব্বিশ বছরের নিষ্ঠুর স্টীমরোলার খুইয়ে আবার পর্বতে ফিরে গেছে। আজ বাঙলা একান্তই বাঙালির। শাসক বাঙালি, শাসিত বাঙালি, পলিটিশিয়ান বাঙালি, নেতা বাঙালি। বাংলাদেশ আজ বাঙালির স্বাধীন আবাসস্থল। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে—এ জাতিকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা কেমন বাঙালি? বাঙালির পলিটিকস কী? কী এর বৈশিষ্ট্য?

আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের কথা বলা হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে তাই আমাদের একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, কারণ, ওই দপ্তরের শরণ নেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। বঙ্কিম প্রায়ই আক্ষেপ করতেন বাঙালির ইতিহাস নেই বলে, কিন্তু বাঙালির যে পলিটিকসও নেই, সম্ভবত তাঁর আগে এমন স্পষ্ট করে এটি আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেন নি। এদেশের পলিটিকস সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ছিল। তারই আলোকে পলিটিশিয়ানদের প্রতি বঙ্কিমের এই উপদেশটি পরীক্ষা করা যাক—

> ভাই পলিটিকস্‌ওয়ালারা,···হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহীমাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল তাহাদের পলিটিকস্ নাই। ‘জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো’ ইহাই তাহাদের পলিটিকস্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিকস্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

অনৈক্য, ভীরুতা এবং ভিক্ষাবৃত্তি তথা পরজীবীমূলক জীবনাচরণ যে বাঙালি পলিটিশয়ানের ব্যর্থতার কারণ তা তিনিই সর্বপ্রথম নির্দেশ করেছেন। নেতৃত্বের এই চরিত্র যে দীর্ঘকাল পলিটিকসকে, সেই সাথে সমগ্র জাতিকে দুর্দশাগ্রস্ত করে রাখবে, তার ইঙ্গিতও আমরা বঙ্কিমের মন্তব্য থেকে পাই এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হয় নি। আমরা আরো কিছুকাল পেছনে গিয়ে অনুসন্ধান করলে বঙ্কিমকথিত পলিটিশিয়ান-চরিত্রের মৌলিক দিকটির পরিচয় পেতে পারি।

এটা সবার জানা, ইংরেজরা বাঙলা অধিকার করেছিল বাহুবলের দ্বারা নয়। এদেশীয় একশ্রেণীর উঠতি বণিক ও কাঁচাটাকার মালিক এবং কিছু ক্ষমতালোভী আমলার সাহায্য পেয়েই তারা ষড়যন্ত্রে জয়ী হয়েছিল, যুদ্ধে নয়। আমাদের আজকের পলিটিশিয়ানদের সামাজিক অবস্থান ও চরিত্র, তাদের স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষাকে তাই বিচার করতে হবে আড়াইশ বছর আগে এ জাতির সেইসব লোকদের ক্ষমতালোভী কর্মকাণ্ড তথা পলিটিকস দিয়ে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম অতিবাহিত হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি জাতির মাঝে লুকিয়ে থাকা হীন প্রবণতা ধুয়েমুছে যায় না, এর দায় ভোগ করতে হয় আরো অনেক-অনেক সময় ধরে, যদি না নতুন শিক্ষা বা নতুন ‘বোধ’ দ্বারা জাতিকে উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাঙালি পলিটিকস-এ হাত পাকিয়েছে নিজ-জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে।

ইংরেজ প্রভুর শোষণ-শাসনের প্রতি সাধারণ ভারতবাসীর ক্ষোভ ছিল, ঘৃণা ছিল। আর এই সুযোগটা গ্রহণ করেই লাভবান হয় পুঁজিবাদী বিকাশের ধারায় গড়ে ওঠা আধা-সামন্ত, আধা-বেনিয়া জগাখিচুড়ি মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি—যা ভারতের রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এদের স্বার্থ ছিল সাধারণ ভারতবাসীর স্বার্থের বিপক্ষে। অর্থাৎ ব্রিটিশ-উৎখাত নয়, স্ব-শাসন নয়, কেবল ব্রিটিশ-অনুগ্রহ অর্জনই এদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যে-কোনো সমাজ-বিকাশের নিয়মানুসারে anti-thesis হিসেবে চরমপন্থা তথা গোঁড়া স্বাদেশিকতাও মতবাদ হিসেবে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

আমাদের দেশের পলিটিকসে জঙ্গিমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ সেকাল থেকে সঞ্চিত গোঁড়ামির এই ধারাটিই আজো বহন করে চলেছে।

যাই হোক, নববিস্তৃত মধ্যবিত্ত-আধাসামন্ত শ্রেণীটি কৌশলে জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশের সাথে দর-কষার সুযোগ করে নেয় এবং শাসককর্তৃক পরিপুষ্ট ও লালিত হতে থাকে। যেহেতু সর্বভারতীয় জাতীয়তা দূরে থাক, আঞ্চলিক জাতীয়তার ভিত্তিতেও ভারতের সমগ্র জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ ছিল না, তাই এই নবগঠিত তাঁবেদার শ্রেণীটির প্রতিভূগণ আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এবার এরা অনুভব করে, দেশশাসনে তাদেরও ভাগ থাকা উচিত এবং ওইরকম প্রয়োজনেই জন্মলাভ করে আধুনিক ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন—কংগ্রেস।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশকর্তৃত্ব বিলুপ্তির মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত কংগ্রেস যে প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে তাতে প্রথম দিকে সামন্ত-ভূস্বামীদের আধিপত্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস হয়ে উঠেছে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজস্ব সংগঠন। একথা অপর বৃহৎ রাজনৈতিল দল মুসলিম লীগের ক্ষেত্রেও খাটে। এ সময়ে, মনে রাখতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ সকল রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন, আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙলার জনগণের অবদান অসামান্য, বলা যায় সবার ওপরে থাকলেও মুষ্টিমেয় জাতি-হিতৈষী বাঙালি পলিটিশিয়ান ছাড়া বাঙালির স্বার্থসংরক্ষণে পারঙ্গমতা দেখাতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল জনগণের নেতারা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল বাঙালি পলিটিশিয়ানরা কেউ হিন্দু অথবা কেউ মুসলিম—পুরোপুরি বাঙালি নয় কেউই। ফলে, যা ঘটার তাই ঘটল। ভারতের বৃহত্তম জাতি হয়েও বাঙালিকে বঞ্চিত হতে হল আরেকবার। বাঙালির স্বপ্ন আরেকবার চূর্ণ হল মাঝপথে। যদি বলি এজন্যে দায়ী কে, আমার নিজের অন্তত বিশ্বাস, গোষ্ঠীস্বার্থবাদী পলিটিশিয়ানের মাপেই তৈরি হওয়া উচিত ইতিহাসের এই নীরব কাঠগড়া।

ভারতবিভক্তির পর পূর্ব-পাকিস্তানি পলিটিশিয়ানদের একদল গান্ধীর চরকা-কাটা সুতোয় তৈরি খদ্দরের পাজামা-পানজাবি-ধুতি এবং অন্যদল শেরওয়ানি-আচকান-জিন্নাটুপিতে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে চাইল। খদ্দরপন্থীরা কৃচ্ছ্রতা, স্বদেশীয়ানা এবং culture সম্পর্কে যেসব বক্তৃতা দিত এবং বিপ্লবের মন্ত্রধ্বনিতে বাতাস ভারী করে তুলত, তাতে তাদের পরিধেয় বস্ত্রের বৃথা অপচয়ের দুর্নাম ঢাকা পড়ত না (স্মর্তব্য, এরা এমন ঢোলা পাজামা-পানজাবি পরত যে একটি পাজামায় ব্যয়িত কাপড়ে অন্যূন দুজন বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ করা যেত)। অন্যদিকে শেরওয়ানিওয়ালাদের পলিটিকস জাতিকে কতটা পিছিয়ে দিয়েছিল তা পাঠকের অজানা নয়।

আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে খদ্দর ও শেরওয়ানি দুটোই টিকে আছে কষ্টে—আর সবকিছু ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে এখন উদয় হয়েছে নতুন যুগের বার্তাবাহী এক অভিনব গোষ্ঠীর। আশ্চর্য! সেই ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলের বেনিয়া স্যুট-প্যানট-টাইয়ের পুনরাবির্ভাব যেন ঘটে গেল অতি নিঃশব্দে। এদের হাব-ভাব দেখলে মনে হয়, এরা বুঝি নতুন কোনো ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির হয়ে এদেশের বাণিজ্য ও পলিটিকস্ দুটোই গ্রাস করতে লেগে গেছে। আমরা এই নব্য-পলিটিকসওয়ালাদের নাম দিতে পারি “আন্তর্জাতিক বাবু”! বাঙালিত্বসূচক কোনো কিছুর সঙ্গেই এদের জীবনাচরণের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরা কলকাতার সেই পুরনো বাবুদের থেকে পৃথক। এরা নববাবুদের থেকেও পৃথক। আর অতি সম্প্রতি এই গোষ্ঠীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের পলিটিকসে আবার একটি বড়ো ধরনের হাত-বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।

দীর্ঘকাল জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে আসা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত থেকে এবার পলিটিকস ফসকে

বেরিয়ে চলল বিত্তশালী "আন্তর্জাতিক বাবু" সম্প্রদায়ের উদরে।

এই নতুন নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হল, এরা এদের সম্পদ স্বদেশে সঞ্চয় করতে ভীত এবং এদের বংশধররা শিশুকালে নিউইয়র্ক টরেন্টো, লনডন, প্যারিস, সিডনি অথবা ব্রাসেলস্‌কেই জন্মস্থান মনে করে বড়ো হয়। দুর্মুখেরা বলে, আওয়ামিদের মুজিব-কোটগুলো নাকি প্রথম রিলিফের কম্বল কেটেই বানানো শুরু হয়েছিল। যদিও এই নতুন বাবুদের বিরুদ্ধে অমন অভিযোগ নেই, তবু তাদের চকচকে কোট-প্যান্ট-টাই যে বাঙালির হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয়া সমস্ত সুখ ও বিশ্বাসের মূল্যে তৈরি, তাতে সন্দেহ কী? সত্যি, এদের পলিটিকসের জুড়ি মেলা ভার।

আগেই বলেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র পলিটিকস পছন্দ করেন নি, কারণ তিনি মনে করতেন বাঙালির কোনো পলিটিকস নেই। আজকের পলিটিকসওয়ালারা তো তাঁর কোনো লেখাই পড়ে দেখার কষ্ট স্বীকার করবে না। তাই স্থির করেছি জোর করে পড়াব। পলিটিকস কী এবং বাঙালির পলিটিকসের বৈশিষ্ট্য কেমন, তা বঙ্কিম তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরের একটি ছোট্ট রম্য-বর্ণনায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি পাঠকদের কাছে এই বর্ণনাটির অংশবিশেষ তুলে ধরছি এই আশায় যে, অন্তত একটি উপভোগ্য গল্প হিসেবে পাঠ করতেও তাদের কষ্ট হবে না। পলিটিকস-ওয়ালাদেরও না।

গল্পের নায়ক কমলাকান্ত (প্রকারান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে) আফিমের ঘোরে চোখ বুজে এলোমেলো ভাবছিল। স্বল্প দূরে শিবু কলুর বাড়ি। ঝিমুনি সত্ত্বেও চোখ খুলে তাকাতে সে একটি দৃশ্য দেখতে পেল। বঙ্কিমের ভাষাতেই তাহলে চলুন দৃশ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক—

শিবু কলুর পুত্র দশমবর্ষীয় বালক এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেত-কৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া-চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমলধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম, পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া, একবার আড়মোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে-ধীরে এক-এক পদ অগ্রসর হইল, এক-একবার কলু-পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদনপ্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক-এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেনপ্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিলাম—এই ত পলিটিকস—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যন। তখন মনোভিনিবেশ-পূর্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক, কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে-ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘনঘন নিশ্বাস দেখিয়া, কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল এজিটেশ্যন সফল হইল;—কলুপুত্র একখানি মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহসহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টক সম্পর্কে এই সুমহৎ কার্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর-একখানি কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এই ভাবিয়া পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুরপানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়া আর-একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর-একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু-মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধহয় বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র। কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—একমুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুক্কুর ম্যাক-ম্যাক করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুরপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুল সংগ্রহ করিয়া বহুবিধ রাগ-রাগিণী আলাপচারী করিতে-করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই পর্যন্ত দেখে যদি আফিমখোর কমলাকান্ত ক্ষান্ত হত, তার দিব্যচক্ষুর পাতা বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে আমরা আরেকটি ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা হয়তো জানতে পেতাম না। সৌভাগ্য। আফিমের নেশায় তখনো ভাটা পড়ে নি তার। কমলাকান্ত দেখল—

এই অবসরে আর-একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদর-পূর্তির জন্য বহুবার কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোল-বিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতর নয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গো-ভাগাড়ে যাইতে পরামর্শ দিতে-দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাহার হৃদয়-মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশ মতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে-দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিকস। দুই রকমের পলিটিকস দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়।

পলিটিকসের রকমফের সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই কৌতূহলী পর্যবেক্ষণ নিতান্ত ঠাট্টা-মশকরা ছিল না। এর মাঝে লুকায়িত আছে একটি নির্মম সত্য। কুক্কুরজাতীয় পলিটিকসের ভেতর তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি, আর বৃষজাতীয় পলিটিকসকে ঘৃণা করেছেন কারণ, দস্যুবৃত্তি, জিঘাংসা এবং এর অন্তর্নিহিত দানবশক্তির তাণ্ডবকে পলিটিকস বলার সাধ্য তাঁর ছিল না।

আমরা কি আজ বাংলাদেশে এই দুইরকম পলিটিকসের খোলা বাজারে আদর্শের sole agent-দের মুনাফাবাজি, কাড়াকাড়ি, হানাহানি প্রত্যক্ষ করছি না? একদিকে পরান্নজীবিতা, সুবিধাবাদ ও অন্যদিকে আদর্শের নামে সীমাহীন হিংস্রতা-উগ্রতা-হুজুগের পৃষ্ঠপোষক সেজে একশ্রেণীর পলিটিশিয়ান কি দীর্ঘকাল ধরে সমাজ-জীবনকে অশান্ত, চির-রোগগ্রস্ত করে রাখে নি?

এই কি বাঙালির পলিটিকস?

এই কি একদা প্রাচীন ভারতের শাসক, শৌর্য-বীর্য-মেধায় অতুলনীয় একটি জাতির শেষ পরিণতি?

ইতিহাস বলে, একদা বাঙালি জাতি নিজ ভূখণ্ডের

বাইরে বহুদূরের লঙ্কাদ্বীপ-লাক্ষাদ্বীপসমূহ জয় করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই শ্রেষ্ঠত্ব যে জাতি ধারণ করেছে তার যে পলিটিকস ছিল তাতে আর সন্দেহ কী? সে জাতি যে যোগ্য নেতা প্রসব করেছিল তাতে আর অবিশ্বাস কোথায়? অথচ আজ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মনে আশঙ্কা জাগে, পৃথিবীতে জাতি হিসেবে টিকে থাকার মত মনোবল ও জীবনীশক্তি হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

বাঙালি কি তবে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে উপনীত? ইতিহাসে বহু সমৃদ্ধ জাতির পতনের ইতিকথা আমরা জেনেছি। একদা বিকশিত বিরাট সব সভ্যতা কিভাবে ভুলপথে পা দিয়ে হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল-গর্ভে—আজকের আধুনিক মানুষের তা অজানা নয়। বাঙালির বর্তমান দুর্গতির বোঝা এত ভারী যে বিশ্বাস করতে ভয় হয়, কালের বিশাল থাবা উপেক্ষা করে এজাতি উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারবে, হারিয়ে যাবে না তাদের মতো, যাদের পুঞ্জীভূত পাপ ক্ষমা করে নি মহাকাল।

আমাদের পলিটিশিয়ানের একটি বড়ো চালাকি—'প্রতিশ্রুতি'। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো বিজ্ঞাপনী স্টাইলে গণতন্ত্র, উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির যেসব গালভরা প্রতিশ্রুতি এদেশের গরিব জনগণ তাদের পলিটিকসওয়ালাদের কাছ থেকে অহোরাত্র উপহার পাচ্ছে তাতে কি জাতির ক্রমাবনতি রোধ করা গেছে? সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ টেনে বলা যায়, সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন ঠেকানো যায় নি বস্তা-বস্তা বিপ্লবী বুলি ও ঠাট-সর্বস্ব উন্নয়ন-পরিকল্পনা দিয়ে। এদেশীয় গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী অথবা বিপ্লবপন্থীদের কি এর থেকে কিছুই শেখার নেই? ছিচকে চোর-ডাকাতরাও আজকাল আধুনিক প্রযুক্তির যুগে তাদের চুরি-ডাকাতির কৌশল পালটেছে; রামদাওয়ের বদলে কাটা-রাইফেল, ককটেলের ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছে, অথচ লজ্জার কথা—আমাদের পলিটিশিয়ান গোষ্ঠীর ধ্যান-ধ্যারণায় মধ্যযুগীয় উপাদানগুলো কিরকম বিকট ভঙ্গিতে এখনো জানান দেয়—সমগ্র জাতি আজ অজ্ঞতার হাতে বন্দী, সংস্কারের হাতে অসহায়।

অথচ সমাজপরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ অনুসন্ধানের জন্য বাইরের অভিজ্ঞতাটুকু বুঝলেই চলে, আর আমাদের সমাজের গঠনকাঠামো সম্পর্কে সুগভীর ধারণা অর্জন দ্বারা বাকি কাজ এগিয়ে নেয়া যায়। প্রাচ্য তথা ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী ধারার উলটো পিঠে কর্মবাদের সরব অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণীর লোক তাই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও উদ্ধার করেও নিজ দেশের মাটিতে বপন করতে ব্যর্থ হয় প্রগতির চারাগাছ। মূলত কর্ম ও কর্মীর দর্শন হল মার্কসবাদ, কিন্তু বামপন্থার দাবিদার এই লোকগুলো বোধকরি জানে না এই মতবাদের উপযুক্ত স্থানীয় ভিত্তি বহু আগে থেকেই ভারতীয় কর্মবাদের দার্শনিক অস্তিস্তের মাঝে ক্রিয়াশীল রয়েছে। রয়েছে রাজনীতিকে যুগোপযোগী ও নিজ-সমাজোপযোগী করে গড়ে তোলার বিচিত্র সব উপাদান। এ যেন চিন্তা-জগতের পথে-ঘাটে মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি—শুধু কুড়িয়ে নেয়ার অপেক্ষা। কিন্তু কুড়োয় না কেউ। স্বর্ণপ্রভ দর্শন কেঁদে ফেরে গৃহীর দ্বারে-দ্বারে—গৃহী খোলে না দ্বার। ভিনদেশী চতুর মুসাফির শুধু হুহাতে কুড়িয়ে নেয় আলগোছে এবং হয়তো ভেবে খুশি হয়;—এরা তো জন্মান্ধ একদল মানুষ।

তাই সমাজতন্ত্রী হওয়ার জন্য নিজেদের সমাজ-দর্শনকে উপেক্ষা করে চীন-রাশিয়ার কৃপা-হস্তের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকা পলিটিশিয়ান যে বঙ্কিমকথিত 'কুক্কুরজাতীয়' পলিটিকসেরই উপযুক্ত প্রতিনিধি, আশা করি পাঠক তা বুঝতে পারবেন নির্দ্বিধায়। অন্যদিকে সৌদী-মার্কিন, অথবা ইরান-তুরানের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে যারা রাজনীতির নামে এদেশে রণোন্মাদনা সৃষ্টি করে চলেছে, তাদের 'বৃষজাতীয়' পলিটিকসের ঘৃণিত বরকন্দাজ ছাড়া সচেতন পাঠক আর কিছু মনে করবেন কি?

তাহলে, আজই আমাদের জনসাধারণকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা আর কতকাল কুকুর ও ষাঁড়ের আহ্বানে বৃথা সাড়া দিয়ে যাবে। বৃথা স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগের দ্বারা 'কতিপয়ের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে আর কতবার, কত উপায়ে।

যারা এদেশের মাটিতে জন্মে, এদেশের আলো-হাওয়ায় বড়ো হয়েও ধারকরা বিদেশী রদ্দি মতবাদের ব্যবসায় লিপ্ত তারা আর যাই হোক দেশপ্রেমিক নয়। যারা আদর্শের নামে স্বপ্ন দেখে ধূ-ধূ মরুর বুকে খাটানো সারিবদ্ধ বেহুইন তাঁবুর—বাঙলার ধর্মপ্রাণ জনগণের বুঝতে হবে, এদের দেশপ্রেম আর শৃগালের মুরগী-প্রেমে ব্যবধান অল্পই। এই দেশ, এই মাটি, এই দুঃখজীর্ণ কঙ্কালসার নর-নারীর প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের সাথে নেই এদের বিন্দুমাত্র সংযোগ। এরা শেকড়হীন পরজীবী শ্রেণী। এদের নিজস্ব অভিধানে "দেশপ্রেম" একটি নিষিদ্ধ শব্দ। অর্থ এবং ক্ষমতার্জনকেই এরা মোক্ষ বলে জেনেছে এবং আদর্শের আলখাল্লায় ঢেকেছে নিজেদের বীভৎস চেহারাগুলো।

দেশপ্রেমিক জনগণ আর কতকাল এদের অভিনীত পলিটিক্যাল নাটকাগুলির নীরব দর্শক হয়ে থাকবে? আর কতকাল এদের প্রদর্শিত দেশপ্রেমের ফাঁকি কোথায় তা বুঝে উঠবে না? বাঙালি মানুষ হবে কবে?

দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং দৃঢ়সংকল্প থাকলে, আমাদের বিশ্বাস, মত-পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও দেশগঠনে একত্রে কাজ করা যায়। কবি ও বিজ্ঞানীর way of thinking and working ভিন্ন হলেও কবি ও বিজ্ঞানী কখনো দুটি পৃথক গন্তব্যের যাত্রী নন। কবি যে চিন্তাশক্তি ও সৌন্দর্যদৃষ্টির সাহায্যে সত্যে উপনীত হন, বৈজ্ঞানিক সেই সত্যে পৌঁছুতে ব্যবহার করেন প্রণালী পদ্ধতিনিয়ন্ত্রিত গাণিতিক মেধা ও বস্তুজ্ঞান। তাই কবি ও বিজ্ঞানীর মহামিলন মহাসত্যই উদ্‌ঘাটন করে থাকে যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাদের দুই ভিন্ন মেরুর অধিবাসী বলে মনে হয়। তেমনি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী পলিটিশিয়ানদের মাঝে মতবাদের পার্থক্য থাকলেও একটি সক্রিয় সমঝোতার মধ্য দিয়ে জাতীয় পুনর্গঠনে শামিল হওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়। যে 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য' স্থাপনের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, একমাত্র দেশপ্রেমিক সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিই তা নিশ্চিত করতে পারে রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। আমেরিকার মতো একটি অসংখ্য ভাষা, অজস্র জাতি-গোষ্ঠীর এবং অগুন্তি আঞ্চলিক স্বার্থ-সংযুক্ত মানুষের দেশে কী করে দীর্ঘকাল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান তা বিশ্লেষণ করলে তাদের সংবিধান, বিচার-ব্যবস্থা এসব আলোচনায় আসবে, কিন্তু 'আমরা আমেরিকান', 'আমাদের অস্তিত্ব আমেরিকা', 'আমাদের গর্ব আমেরিকা'—এমন ভাবানুভূতির রসধারায় যে জাতির হৃদয় পরিপূর্ণ, তাদের চেতনার শক্তিই যে তাদের ঐক্য সংরক্ষণ করছে তা ভুললে চলবে না। এর পাশাপাশি প্রায় একই নরগোষ্ঠীর জনপদ বাংলাদেশে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পেছনে দারিদ্র্য, শোষণ, বাইরের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কারণগুলোই কেবল নির্দেশ করা হয়। অথচ, জাতি হিসেবে যে গৌরব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবোধ থাকলে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি তৈরি হতে পারে, তা বলা হয় না। 'বাঙালি, বাঙলা' এই শব্দগুলোর প্রয়োগ এখন আর কোনো গৌরবের সাথে যুক্ত নয়। 'বাঙলা মদ' বলতে আমরা বুঝি সবচেয়ে সস্তা ও নিকৃষ্ট নেশাকর তরল; বাঙলা সাবানও তাই। উদ্ভট খ্যাপামি কিংবা বাচাল স্তাবকতাকে শেষ পর্যন্ত আখ্যায়িত করা হয় 'বাঙ্গালী কায়দা' বলে। তা ছাড়া এলোপাথাড়ি হাস্যকর মারপিটকে 'বাঙ্গালী মাইর' বললে লোকে বোঝে ভালো। অর্থাৎ সমাজের যা কিছু নীচ, যা

কিছু সস্তা, যা কিছু মহত্ত্বহীন তাকেই বাঙালিপনা হিসেবে চিত্রিত করে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের চেতনায় কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে নিজ জাতি সম্পর্কে মন্দ ধারণা। বাঙালির ত্রুটির দিকটিকে বড়ো করে দেখিয়ে, ঢেকে রাখা হচ্ছে গৌরবের অংশ। বাঙালি চরিত্রের দুর্বলতর গাঁথুনিকে ফোকাস করে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে বলিষ্ঠ দিকগুলো এবং ধীরে-ধীরে মনস্তাত্ত্বিক সূত্রানুযায়ী জাতির মনে স্থান পাচ্ছে নিজ জাতি সম্পর্কে অকারণ লজ্জানুভূতি। বাঙালি ভুগছে আত্মবিশ্বাসের তীব্র অভাববোধে। সুতরাং জাতীয় ঐক্য বিলম্বিত হচ্ছে, বাঙালির অন্তর থেকে অবচেতনভাবে নিরুদ্দিষ্ট হচ্ছে দেশপ্রেম। আজ বাঙালির জাতীয় জীবনের সঙ্কট মূলত এই আত্মপরিচয়হীনতার সঙ্কট।

এই সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় কী? পলিটিকস-ওয়ালাদের কাঁধে ছিল মূল দায়িত্ব;—বাঙালিকে জাতীয় সচেতনতার শিক্ষা দেওয়ার। আজ তাদেরই ধরেছে ক্ষয়রোগে। কে আজ বাঙালি পলিটিশিয়ানকে উদ্ধার করবে? কোন্ সে শক্তি, যে বাঙালির পলিটিসকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে নতুনভাবে?

আমাদের বিশ্বাস, এমন শক্তি এই ভগ্নপ্রায়, জরাগ্রস্ত সমাজদেহের অভ্যন্তরেই বিরাজ করছে। সকল পলিটিশিয়ান গোষ্ঠীর মাঝেই ভালো-মন্দ, সুজন-দুর্জন আছে; যেমন মানব-শরীরেই আছে ব্যাধির পাশাপাশি ব্যাধিনিরাময়ের অমূল্য উপাদান। তাই আজ দরকার সমাজদেহে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে অবস্থিত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক-সমাজশক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া। দরকার মতবাদের নামে মতান্ধতা বিসর্জনের সবল মানসিকতা অর্জন। এই মুক্ত মানসিকতার অভাবে কী ঘটে তা রাস্কিন একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। একজন কুমারী তার বিগত প্রেমের গান গাইতে পারে, কিন্তু একজন কৃপণ কি তার হারানো টাকার গান গাইতে পারে?—রাস্কিন বলছেন, না। একজন কৃপণ কখনো তার হারানো টাকার গান গাইতে পারে না। কারণ, যদি সে তার ক্ষতির জন্য গান গায়—তবে তার গান কাউকে বিচলিত বা তার প্রতি সহানুভূতিশীল করবে না।

আমাদের দেশের একশ্রেণীর দায়িত্বহীন পলিটিশিয়ান স্বৈরতন্ত্র, শোষণ ও সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে কেবল মৌখিক গালাগাল বর্ষণের পর গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বা খেলাফততন্ত্রের জন্য যেমন করুণস্বরে আর্তনাদ করে থাকে তা কি সেই কৃপণের টাকা-হারানো গানের মতো শোনায় না?

এতসব নিন্দা-সমালোচনার পরেও এটা ঠিক যে জাতির ভাগ্যোন্নয়নে সঠিক ধারার পলিটিকসের কোনো বিকল্প নেই। তাই পলিটিকস থেকে দূরে সরে থাকা সচেতন নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয় কোনোক্রমেই।

আমরা শুধু একটা প্রয়োজনের কথা বলব, সেটি দেশপ্রেম। বাঙালির পলিটিকসকে উন্নততর নৈতিক আদর্শের বাঁধনে বাঁধতে দরকার বুকভরা খাঁটি দেশপ্রেম। আর দেশপ্রেমের পাঠ মানুষ পায় আধুনিক শিক্ষার দ্বারা। নিজের দেশ, জাতি, সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা। যদি এদেশের পলিটিকসওয়ালারা এই সত্যটি অনুধাবন করতে না পারে তবে এ জাতির পতন অনিবার্য। পলিটিকস-এর সাথে যদি পর্যাপ্ত জ্ঞানের, শিক্ষার, রুচির সংমিশ্রণ না ঘটে, তাহলে বাঙালির পলিটিকস ও পলিটিশিয়ানের ভবিষ্যৎ নেই। গ্রাম্য টাউটদের ক্রিয়াকলাপ তথা village politics এবং রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য তা যদি নেতৃত্ব-কামীরা তাদের আচরণ ও কার্যব্যবস্থার উৎকর্ষের দ্বারা জনগণের সামনে তুলে ধরতে না পারে, তাহলে পলিটিকস এদেশে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠবে না। বাঙালির পলিটিকসের উন্নতি নির্ভর করছে রুশ, চীনা, আরব অথবা মার্কিনি জাতির নাড়ি-নক্ষত্র জানার ওপরে নয়;—একান্তই বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরলস অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও অনুশীলনের মধ্যে। এই ধ্রুব সত্যটি এদেশের মুক্তমনা পলিটিশিয়ানরা যত দ্রুত অনুধাবন করবে, বাঙালির জাতীয় জীবনে ঘনীভূত দুর্ভেদ্য অন্ধকার ততই ফিকে হয়ে আসতে থাকবে। বহুদিনের আবর্জনা সরিয়ে ধীরে-ধীরে সন্তর্পণে জেগে উঠতে থাকবে একটি বিস্মৃতপ্রায় অনিন্দ্য মানবমূর্তি—বাঙালি যার নাম।

আশরাফ শামীম বাংলাদেশের কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ—"শব্দায়িত ধনুক উদগ্র প্রত্যাশায়"।

মতামত

সোমপা ইন্দ্র

অরুণা হালদার-লিখিত "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" শিরোনামের তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধটি পড়ে উপকৃত হয়েছি। শুধু তাঁর দুটি মন্তব্য সম্পর্কে সামান্য কিছু জানাচ্ছি।

ইন্দ্র চরিত্রের দোষগুণ উল্লেখে তিনি তাঁকে 'শক্তিমান' বলে শুরু করে 'বৃষমাংসপ্রিয়' বলে শেষ করে ফেলেছেন। এতে ইন্দ্রের একটি অতি প্রিয় বস্তুর উল্লেখ বাদ পড়ে গেছে—ইন্দ্র অত্যন্ত সোমরস-প্রিয় ছিলেন। সেজন্যেই অনেক ঋকে তাঁকে 'সোমপা' বলেই সম্বোধন করা হয়েছে, এবং যেখানেই ইন্দ্রের উল্লেখ আছে সেখানেই 'সোমরস'-এর উল্লেখও আছে। তিনি তাঁর অসীমবীরত্বপূর্ণ যত কাজ করেছেন (যেমন বৃত্রবধ) সবই করেছেন প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করে হৃষ্ট বা প্রমত্ত হবার পর। যেমন বিভিন্ন ঋকে ইন্দ্রকর্তৃক তিনশত বৃষের মাংস ভক্ষণের কথা বলা আছে (৫/২৯/৮), তেমনি ইন্দ্র একসঙ্গে ত্রিশটি সোমপূর্ণ পাত্র যুগপৎ পান করলেন এমন কথাও বলা হয়েছে (৮/৭৭/৪) বা এমন কথা যে ইন্দ্রের উদর হ্রদের ন্যায় সোমের আধার (৩/৩৬/৮)। সুতরাং বৃষমাংসের উল্লেখ করলে ইন্দ্রের সোমরসপ্রীতির কথাও বাদ দেওয়া চলে না।

দ্বিতীয়ত, লেখিকা মন্তব্য করেছেন যে 'আর্যগণ যজ্ঞ করত', 'দেবতাদের স্তবস্তুতি করে, তুষ্ট করে প্রার্থনা জানাত' কিন্তু 'সুকুমারতাপূর্ণ আত্মনিবেদন' তাদের নিজস্ব নয়, অপরের কাছ থেকে পাওয়া। এ মন্তব্যটি বোধহয় সম্পূর্ণ যথাযথ বলে মেনে নেওয়া যায় না। এ কথা ঠিক যে, আর্যরা স্তবস্তুত করে অধিকাংশক্ষেত্রে অন্ন, ধন, বল, বাসগৃহ, আয়ু, পুত্রপৌত্রের কল্যাণ, শত্রুর সর্বনাশ ইত্যাদিই চেয়েছেন বার বার, কিন্তু নিজেদের মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে এমন প্রার্থনাও চোখে পড়ে যাদের আত্মনিবেদন থেকে খুব ভিন্ন করে দেখা যায় না। যেমন, 'আমাদের অমতি (বা দুর্মতি) দূর করো' (৪/১০/৬) বা 'যেরূপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয়, সেরূপ আমাকে শিক্ষা দাও। আমার কেউ আপ্তবন্ধু নেই, আমি অজ্ঞান, আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব নেই, বুদ্ধি নেই……' (১০/৩৯/৬) বা ৯/৬৭/২৭এ 'দেবতারা আমাকে পবিত্র করুন। বন্ধুগণ তাদের নিজ কার্য দ্বারা পবিত্র করুন। হে অশেষ দেবতা! আমাকে পবিত্র করো। হে অগ্নি! আমাকে শোধন করো'। এ প্রার্থনা বা আত্মনিবেদনটির সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের একটি গানের এই কথাগুলো মনে করলে ('আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে') এ ধারণাই হয় যে যেমন এ যুগের কবি তেমনই সুদূর অতীতের আর্য ঋষি একইভাবে তাঁদের কোনো-কোনো প্রার্থনার ভেতর দিয়ে আত্ম-নিবেদনই জ্ঞাপন করেছেন। ইতি—

কল্যাণকুমার দত্ত
বি-১১/২০ কল্যাণী, নদীয়া